পশ্চিমবঙ্গ

বর্ষ ২১ ॥ সংখ্যা ১৯ ॥ ২০ নভেম্বর ১৯৮৭ ॥ ৩ অগ্রহায়ণ ১৩৯৪



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

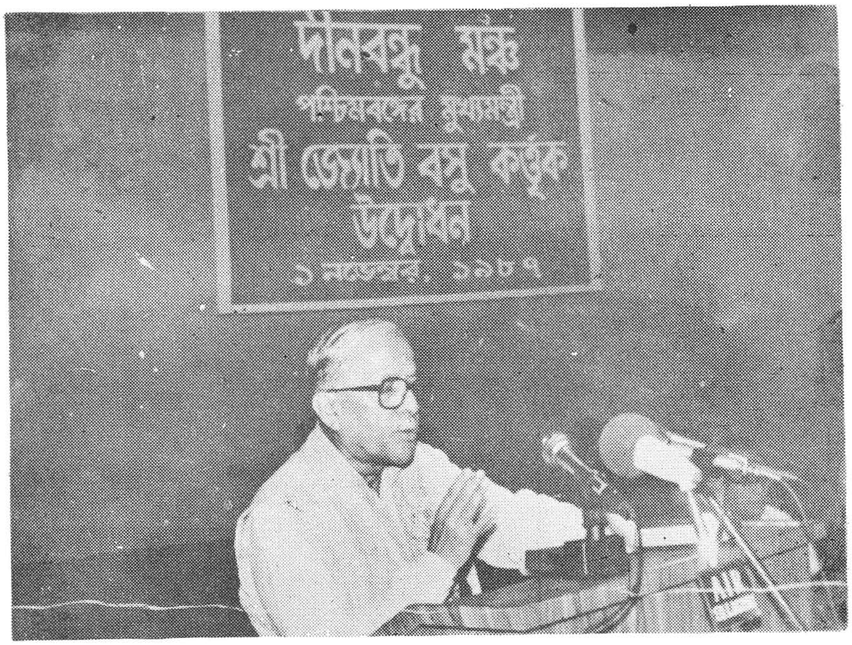
স্ক্যান ঃ ইলা কুণ্ডু

এডিট ঃ সুজিত কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com



১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ শিলিগুড়িতে তথ্যকেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতারত মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু

পশ্চিমবঙ্গ

২০ নভেম্বর ১৯৮৭

গ্রাহক হবার নিয়মাবলী

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।
চাঁদা অগ্রিম দিতে হবে। বার্ষিক চাঁদা সডাক ১০ টাকা।
ষান্মাষিক সডাক ৫ টাকা।

পাঠকদের প্রতি

পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা প্রসঙ্গে চিঠিপত্র লেখার সময় জবাবের জন্য চিঠির সঙ্গে স্ট্যাম্প বা পোস্টকার্ড পাঠানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনবোধে সব পত্রের উত্তর দেওয়া হয় এবং সরকারি চিঠিপত্রে সার্ভিস ডাকটিকিটই কেবল ব্যবহার করা চলে।

প্রধান সম্পাদক

প্রীতীন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

সম্পাদকঃ ধীরেন্দ্র দত্ত

মনি অর্ডারে টাকা পাঠাবার ঠিকানাঃ

তথ্য অধিকর্তা
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
২৩ আর এন মুখার্জি রোড
কলিকাতা–৭০০০০১

সম্পাদকীয় দপ্তরঃ
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিষয়সূচি

প্রতি সংখ্যার দাম ২৫ পয়সা

পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্য সরকারের সাপ্তাহিক মুখপত্র

বর্ষ ২১ ।। সংখ্যা ১৯ ।। ২০ নভেম্বর ১৯৮৭।।৩ অগ্রহায়ণ ১৩৯৪

অর্ধশতাব্দীর স্বপ্ন বাস্তবায়িত

পূর্ণাঙ্গ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন যেন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে না থাকে

—মুখ্যমন্ত্রী

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছে। 'সাফ' গেমসের অনুষ্ঠান হবে এখানে। গেমস শেষ হলেই এই স্টেডিয়াম যাতে ব্যবহার করা যায় সেজন্য এখন থেকেই কর্মসূচি ঠিক করতে হবে। এতবড় ক্রীড়াঙ্গন যেন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে না থাকে। অন্য রাজ্যের ছেলেমেয়েদের এখানে আমরা নিয়ে আসতে পারি, প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করতে পারি সে পরিকল্পনা নিতে হবে।

গত ১৪ নভেম্বর ১৯৮৭ এশিয়ার বৃহত্তম স্টেডিয়াম যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের উদ্বোধনী ভাষণে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু উপরোক্ত কথা বলেন।

শ্রীবসু বলেন, এই ক্রীড়াঙ্গন আমরা বেশ কয়েক বছর ধরেই তৈরি করছি। আমাদের সংগতি কম। তাই বিভিন্নভাবে সাহায্য নিয়ে আমরা এই স্টেডিয়াম গড়েছি। প্রথম পর্যায়ে এই স্টেডিয়ামের কাজ যখন শেষ হয়, তখনও বড় বড় খেলাধূলার আসর এখানে বসেছে। তবুও একটা অভাব যেন থেকে গিয়েছিল। এই স্টেডিয়ামকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার পরিকল্পনা আমাদের ছিল। টাকার অভাবে তা হয়ে উঠতে পারে নি। আজ সকলের সাহায্য ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তা বাস্তবায়িত হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সাফ' গেমস এখানে হবে। বিভিন্ন দেশের প্রায় ৯৫০ জন প্রতিযোগী ও বহু কর্মকর্তা এখানে আসবেন। আমরা তাঁদের স্বাগত জানাই। কয়েকদিন আগে ক্রিকেটের এক বিরাট অনুষ্ঠান হয়ে গেল কলকাতায়। আমরা অতিথিদের স্বাগত জানানোর জন্য মানুষের কাছে আবেদন জানিয়েছিলাম। সব ব্যবস্থাই যে আমরা সুষ্ঠুভাবে করতে পারি, ক্রিকেটের সেই আসরেই আমরা জনগণের সংগে মিশে একযোগে কাজ করে তা প্রমাণ করতে পেরেছি।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীর বক্তৃতা প্রসংগ উল্লেখ করে শ্রীবসু বলেন, খেলাধূলার মধ্যে দিয়ে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা, শান্তির বাতাবরণ গড়ে তোলা এটা একটা বিশেষ দিক। খেলাধূলায় কেবল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগীরা আসবেন। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন বজায় আছে। সমস্ত প্রতিবেশী দেশের সংগে আমরা বন্ধুত্ব গড়তে চাই। চাই শান্তির আবহাওয়া তৈরি করতে। এসবের দায়দায়িত্ব আমাদের উপরে পড়েছে। 'সাফ' গেমস সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হবে। প্রতিযোগীদের অভ্যর্থনা জানাতে হবে। এসব কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে হবে। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আসরের সেরা যে আসর এখানেই হতে পারে তা দেশের মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে।

গত ২২ ফেব্রুয়ারি ক্রীড়াদিবসে বিভিন্ন জেলা, মহকুমা, ব্লক পর্যায়ের দৌড়ে সফল ছেলেমেয়েরা শনিবারের অপরাহ্নে আজ বৈদ্যুতিক আলোয় উদ্ভাসিত যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের বিশ্ব সেরা রেকার্টন ট্র্যাকে প্রথম দৌড়ানোর সুযোগ পেলেন। মুখ্যমন্ত্রী মেয়েদের ৮০০ মিটার দৌড়ে ফ্ল্যাগ অফ করে নব সাজে সজ্জিত স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করলেন। এ সময়ে মুখরিত স্টেডিয়াম দেখার মেজাজটাই ছিল আলাদা। কি বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা মানুষের মধ্যে।

কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শ্রীঅজিত পাঁজা বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারে যৌথ প্রচেষ্টায় কত ভালো কাজ হতে পারে এই স্টেডিয়াম তার নিদর্শন। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী বলেন, সারা ভারতে আজ একটি উল্লেখ করার মত দিন। অনেক দেশের স্টেডিয়াম দেখেছি, যুবভারতী স্টেডিয়াম তাদের থেকে কোন অংশে কম নয়। এই স্টেডিয়াম আমাদের গর্ব।

শ্রীদাসমুন্সী বলেন, ভারতে যে কোন আন্তর্জাতিক খেলাধূলার আসর পশ্চিমবংগের মত অন্য কোথাও কেউ সংগঠিত করতে পারে না। বিভিন্ন বিষয়ে রাজ্য সরকারের সংগে আমাদের মতবিরোধ থাকতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা একমত হব। মুখ্যমন্ত্রী দিল্লির কাছে যে কোন আন্তর্জাতিক ক্রীড়াআসর এ রাজ্যে করার দাবি জানাতে পারেন। এ ব্যাপারে আমরা একমত। তিনি বলেন, রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রীসুভাষ চক্রবর্তী কেবল স্টেডিয়াম তৈরির কাজেই নয়, রাজ্যের ক্রীড়া উন্নয়নে আন্তরিক প্রচেষ্টা নিয়ে কাজ করে চলেছেন। ক্রীড়ামন্ত্রী বা রাজ্য সরকারের যে কোন ক্রীড়া উদ্যোগের সমর্থনে এগিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

সোসাইটি ফর স্পোর্টস অ্যান্ড স্টেডিয়ামের সচিব ও কলকাতার মেয়র শ্রীকমল বসু তাঁর স্বাগত ভাষণে বলেন, আজ বড় আনন্দ ও গর্বের দিন। এই স্টেডিয়ামের সুযোগ সদ্ব্যবহার করে রাজ্যের যুবশক্তি দেশের মান বৃদ্ধি করবেন, এ আশাই করবো।

অনুষ্ঠানের সভাপতি এ আই এফ এফ-এর সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅশোক ঘোষ বলেন, খেলার জগতে আজ একটা স্মরণীয় দিন। এই স্টেডিয়াম এশিয়ার বৃহত্তম। সারা বিশ্বে হয়ত তৃতীয়।

রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রীসুভাষ চক্রবর্তী আজকের আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, রাজ্য সরকারের সহযোগিতায়, লক্ষ লক্ষ মানুষের সাহায্য ও

কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় তিল তিল করে আমাদের পাঁজর দিয়ে গড়ে উঠেছে এই স্টেডিয়াম। আমাদের এই সম্পদ, এই স্টেডিয়ামকে রক্ষা করতে হবে। প্রতিশ্রুতি দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যে ৯ কোটি টাকা দিয়েছে। আরো ১ কোটি টাকাও দেবে। লটারির সাহায্যে, এ আই এফ এফ, আই এফ এ প্রভৃতি সংগঠন, বিভিন্ন সংস্থা ও সর্বস্তরের জনগণ যেভাবে এই স্টেডিয়াম গড়ে তুলতে সাহায্য করেছেন তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। মাঠে বিশিষ্ট দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তী, শ্রীনির্মল বসু, শ্রীমতী ছায়া বেরা, শ্রীসোমনাথ চ্যাটার্জি, শ্রীবিমান বসু, শ্রীউমাপতি কুমার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের কর্মসূচি শুরুর কথা ছিল ৩-২৫ মিনিটে। কিন্তু বেলা ১২টা থেকেই স্টেডিয়ামে দর্শকদের আনাগোনা শুরু। বেলা বাড়ার সঙ্গে তা দ্রুত হতে থাকে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতে মাঠ ভর্তি হয়ে যায়। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এসে পৌঁছান ৩-১০ নাগাদ। স্টেডিয়ামের প্রবেশ পথে সারিবদ্ধ লালপাড়ের শাড়ি ও লাল ব্লাউজ পরিহিতা মহিলা দল সারিবদ্ধভাবে তাকে অভিবাদন জানান। ফ্রেন্ডস ফর স্টেডিয়ামের কর্মকর্তারা মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে মাঠে অনুষ্ঠান মঞ্চে নিয়ে আসেন। একে একে অন্যান্য অতিথিরাও মঞ্চে আসন নেন। এসময়ে স্টেডিয়ামের ইলেকট্রনিক স্কোর বোর্ডও স্বাগত জানায় মুখ্যমন্ত্রীকে। পুলিস ব্যান্ড সারা মাঠ প্রদক্ষিণ করে।

দুর্গাপুর সেতুর পুনর্নির্মাণের জন্য যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ

সি.এম.ডি.এ আলিপুর রোডে দুর্গাপুর সেতুর পুনর্নিমার্ণের কাজে হাত দেওয়ায় সেতুটি বন্ধ থাকবে এবং যানবাহন নিম্নলিখিত রাস্তায় ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।

(ক) সরকারি বাস সমেত দক্ষিণগামী সমস্ত যানবাহন যেগুলি আলিপুর রোড ধরে নিউ আলিপুর অভিমুখে যাবে, সেগুলিকে গোবিন্দ আঢ্য রোড, চেতলা রোড, এন.আর. এভিনিউ (স্টেশন রোড) দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। এরপর তারা তাদের নির্দিষ্ট রাস্তা ধরে যেতে পারবে।

(খ) সরকারি বাস সমেত উত্তরগামী সমস্ত যানবাহনগুলিকে নিউ আলিপুর থেকে এন.আর.এভিনিউ, চেতলা রোড, পিয়ারীমোহন রায় রোড, চেতলা সেন্ট্রাল রোড এবং আলিপুর রোড দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। এরপর তারা নির্দিষ্ট পথ ধরে যেতে পারবে।

এই নির্দেশ ১২।১১।৮৭ থেকে যতদিন কাজ সম্পূর্ণ না হয় ততদিন পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

ছাত্র সমাজকে সমস্তরকম কুসংস্কার ও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে হবে

–শ্রীজ্যোতি বসু

উনবিংশ শতাব্দীর মনীষীদের আদর্শকে মাথায় রেখে ছাত্র সমাজকে সমস্তরকম কুসংস্কার, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে হবে। ভুললে চলবে না এই বাংলার মাটিতে জন্মেছিলেন রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁরা যেমন আজীবন সংগ্রাম করেছেন আজও আমাদের তেমনি সামাজিক অন্যায়গুলির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

গত ১ নভেম্বর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পঁচিশ বছর পূর্তি উৎসব উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু উপরোক্ত কথাগুলি বলেন। এদিন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানানো হয়। শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারীবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট মানুষজনে অনুষ্ঠান হল ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন তথ্যমন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, খাদ্যমন্ত্রী শ্রীনির্মল বসু, পার্বত্য উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীদাওয়া লামা, সংসদ সদস্য শ্রীআনন্দ পাঠক এবং স্থানীয় বিধায়ক শ্রীগৌর চক্রবর্তী। উত্তরবঙ্গ বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীদীপ্তিভূষণ দত্ত স্বাগত ভাষণ দেন। প্রাক্তন উপাচার্য শ্রীপ্রসাদ ঘোষ ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণা করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রেজিস্ট্রার অধ্যাপক তাপস চট্টোপাধ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার ৪০ বছর পরেও এদেশে সতীদাহ হয়। রাজস্থান সরকারের চিঠি পেয়ে আমরা পুরোনো ফাইলপত্র ঘেঁটে দেখলাম সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহন রায় উনবিংশ শতাব্দীতে গর্জে ওঠার ফলে তৎকালীন বৃটিশ সরকার এই প্রথার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আজও সেই আইন বলবৎ আছে। আমরা রাজস্থান সরকারকে সেসব জানিয়েছি। ছাত্রদের উদ্দেশে তিনি বলেন, এখনও এদেশে অনেক জোচ্চোর নিজেদের 'ভগবান প্রেরিত দূত' বলে দাবী করে প্রকাশ্যে গেয়ে বেড়াচ্ছেন। নিরক্ষর মানুষ কুসংস্কারের বশে সেইসব মানুষদের খপ্পরে পড়ে বিপদগ্রস্ত হচ্ছেন। ছাত্র সমাজের দায়িত্ব হলো এইসব মানুষদের সম্পর্কে নিরক্ষর জনগণকে সজাগ করা। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বুঝতে হবে তারা ভাগ্যবান। তাই উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেয়েছেন। শুধু ডিগ্রি বাড়ালেই চলবে না। বাড়াতে হবে শিক্ষার মান। প্রকৃত মানুষ হতে হবে। অশিক্ষা-কুশিক্ষার অন্ধকারে আছেন যাঁরা তাঁদের শিক্ষিত করার দায়িত্ব নিতে হবে ছাত্র সমাজকেই। মানুষকে বিপথে চালিত করে দেশকে টুকরো টুকরো করার চক্রান্ত যারা করছেন তাদের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজকেই প্রচারে নামতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গে শিল্প স্থাপনের কাজে এগিয়ে এসেছেন। পাঁচটি জেলায় আরও ছোট বড় মাঝারি শিল্প স্থাপন করা হবে। বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠানও উত্তরবঙ্গে কারখানা গড়ার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করছেন। মালদহে বিড়লাদের সঙ্গে রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে ৭০০ কোটি টাকা খরচ করে যে স্টিল প্ল্যান্ট গড়ার প্রস্তাব আছে সে ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন এখনও পাওয়া যায়নি। অনুমোদন এলেই কাজে হাত দেওয়া হবে।

তিনি বলেন, তিস্তা প্রকল্পের জন্য রাজ্য সরকার ২০০ কোটি টাকা খরচ করেছেন। এর মধ্যে কেন্দ্র দিয়েছে মাত্র ৫ কোটি টাকা। তিনি ঘোষণা করেন, এই বিশ্ব বিদ্যালয়ে প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের টাকা রাজ্য সরকার দেবেন।

উপাচার্য শ্রীদীপ্তিভূষণ দত্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমবিকাশের ইতিহাস বর্ণনা করে বলেন, ১৯৬২ সালের ১৯ মে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভ সূচনা হলেও ওই বছরেরই ১ নভেম্বর এই বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের উদ্বোধন হয়। তাই এই দিনটিকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মদিন হিসাবে ধরা হয়। এখন এই রজত জয়ন্তী বর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বঞ্চনায় বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে তীব্র আর্থিক সংকট। উপাচার্য এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন।

পর্যটক আবাসনের উদ্বোধন

গত ১ নভেম্বর ১৯৮৭ সকাল ১০-৩০ মিঃ আনন্দঘন পরিবেশে বিষ্ণুপুরে নবনির্মিত পর্যটক আবাসনের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় সরকারের বাণিজ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী।

বিষ্ণুপুর পুরসভার পর্যটকদের সুবিধার্থে আই. ডি. এস. এম. টি. প্রকল্পে বিষ্ণুপুর শহরের ঐতিহাসিক রাসমঞ্চের সন্নিকটে এই পর্যটক আবাসটি নির্মিত হয়েছে।

নবম অর্থ কমিশনের বিচার্য বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর কাছে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর চিঠি

ডি ও নং ৩১৩–সি. এম
কলকাতা
৩১ অক্টোবর, ১৯৮৭

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

বর্তমান চিঠিটি নবম অর্থ কমিশনের বিচার্য বিষয়গুলি প্রসঙ্গে। সম্প্রতি বিভিন্ন ছক অনুযায়ী কমিশনের নিকট বিবৃতি দাখিল সংক্রান্ত নির্দেশিকাটি আমাদের হাতে এসেছে। আমি বিস্মিত যে রাজ্য সরকারগুলির সাথে কোনোরকম আলাপ আলোচনা না করেই বিচার্য বিষয়গুলি চূড়ান্ত করে ফেলা হল, বিশেষ করে যখন এ প্রশ্নে বড়রকম পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। নবম অর্থ কমিশন রাজ্য সরকারগুলিকে একটি নিয়মানুগ দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে আর্থিক পূর্বাভাস সংক্রান্ত বিবৃতি দাখিল করতে বলেছে। এক্ষেত্রে নিয়মগুলি কী হবে সে প্রশ্নে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে একটা পারস্পরিক বোঝাপড়া থাকা অত্যাবশ্যক। এ সম্পর্কে অর্থ কমিশন যে নির্দেশিকা দিয়েছে তা অস্পষ্ট এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। কী কারণে আগেকার দৃষ্টিভঙ্গিটি বাতিল করা হলো তাও আমার জানা নেই। অনুরূপভাবে প্রচলিত নিয়ম থেকে সরে গিয়ে পরিকল্পনা খাতের রাজস্ব/ব্যয় শ্রেণীর সঙ্গে পরিকল্পনা-বহির্ভূত রাজস্ব/ব্যয় শ্রেণীকে কেন যুক্ত করা হলো তারও কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। পরন্তু কমিশনকে বিক্রয়করের পরিবর্তে অতিরিক্ত অন্তঃশুল্ককে মৌলিক অন্তঃশুল্কের সঙ্গে যুক্ত করার বিষয়ে কতখানি সম্ভাবনা আছে তা খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। আমরা বিক্রয়করের পরিবর্তে অতিরিক্ত অন্তঃশুল্কের ধারণাটি চালু করার সম্পূর্ণ বিরোধী।

কয়েকটি বিষয় আছে যেগুলি রাজ্য সরকারের স্বার্থকে গুরুতরভাবে ক্ষুণ্ণ করছে। আমার অনুরোধ, কমিশন গুরুত্ব সহকারে কাজ শুরু করার আগে রাজ্যসরকারগুলির সঙ্গে এ প্রশ্নে পারস্পারিক বোঝাপড়ার জন্য আলোচনা করা হোক।

শ্রী রাজীব গান্ধী
প্রধানমন্ত্রী, ভারতবর্ষ
নয়াদিল্লী

ভবদীয়
স্বাঃ জ্যোতি বসু

মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দেওয়া হবে ১০ লক্ষ টাকা

১৪ নভেম্বর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে খেলার শেষে ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রীসুভাষ চক্রবর্তী সরকারের এবং এস এস এস-র পক্ষ থেকে ক্রীড়ামোদীদের ধন্যবাদ জানান। একই সঙ্গে জানান সাধুবাদ ও অভিনন্দন।

ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, বিকাল সাড়ে তিনটে থেকে খেলার শেষ পর্যন্ত বৃষ্টির মধ্যেও দর্শকরা খেলা উপভোগ করেছেন। অন্য কোথাও নয় শুধু কলকাতাতেই এটা সম্ভব। আজ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে কলকাতার ইতিহাসে ফুটবলের ক্ষেত্রে বৃহত্তম সমাবেশ হয়েছিলো। মোট ১ লাখ দশ হাজার টিকিট বিক্রি করা হয়েছে। ছাপা হয়েছিলো ১ লাখ ১২ হাজার। এছাড়া ছিলেন চার হাজার পুলিস এবং এক হাজার আমন্ত্রিত দর্শক।

ক্রীড়ামন্ত্রী আরও বলেন, আজকের দিনটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণভাবে চিহ্নিত হবে। পুলিস, প্রশাসন, সংবাদপত্রের সহযোগিতা ছাড়া এই বিরাট কাজ সফল হতো না। একই সঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ঐকান্তিক সহযোগিতাও উল্লেখ করার মতো। সারাক্ষণ বৃষ্টির মধ্যে এতো উদ্যম, এতা পরিচ্ছন্ন ফুটবল এর আগে খুব কম হয়েছে। যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছে আজকের ফুটবল।

ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, আজ হলো আসন্ন সাফ গেমসের স্টেজ রিহার্সাল। আজকের ম্যাচ থেকে টিকিট বিক্রি করে ৮ লাখ টাকা পাওয়া গেছে। বিজ্ঞাপন প্রভৃতি অন্যখাতে সংগৃহীত আরও অর্থ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ১০ লাখ টাকা দেওয়া হবে। সাফ গেমস সম্পর্কে শ্রীসুভাষ চক্রবর্তী আরও বলেন, রাষ্ট্রপতি উদ্বোধনে আসছেন, প্রধানমন্ত্রী আসবেন কিনা এখনও পাকা কথা পাওয়া যায়নি।

আজ প্রাক্তন ফুটবলাররা যে বলটি দিয়ে খেলেছেন সেটি ৫০,০০০ টাকায় নিলাম হয়। কেনেন শঙ্কর বিশ্বাস। ঐ টাকাও ত্রাণ তহবিলে দেওয়া হবে। খেলার টিকিটের লটারির পুরস্কার প্রাপকরার আগামী ১৮ নভেম্বর ফ্রেন্ডস অব্য দ্য স্টেডিয়ামের অফিসে শ্রীসুভাষ চক্রবর্তীর হাত থেকে পুরস্কারগুলি নিতে পারবেন বলে জানানো হয়েছে।

'সাফ গেম্‌সে' ঃ পূতাগ্নি জ্বালাবেন ক্লডিয়াস

'সাফ' গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিদেশী কয়েকজন অতিথি এখানে আসবেন। এঁদের মধ্যে আছেন ভূটানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দাওয়া শেরিং, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদের প্রতিনিধি হিসেবে মেজর জেনারেল সাদিকুর রহমান ও শ্রীলঙ্কার ক্রীড়ামন্ত্রী পেরেরা। আজ 'সাফ' গেমসের অন্যতম সংগঠন সম্পাদক শ্রীগোপীনাথ ঘোষ সাংবাদিকদের এ কথা জানান।

তিনি জানান খরচ কমিয়েও কিভাবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে সুন্দর করা যায় তার চেষ্টা চলছে। ২০ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি আর ভেংকটরমন আনুষ্ঠানিকভাবে গেমসের সূচনা করার পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে।

প্রাক্তন ওলিম্পিক হকি খেলোয়াড় লেসলি ক্লডিয়াস গেমসের পূতাগ্নি জ্বালাবেন। তার আগে 'উড়ন্ত শিখ' মিলখা সিং ও সুব্রতা দেবনাথ অগ্নিশিখা সহ স্টেডিয়াম প্রদক্ষিণ করবেন। আনন্দশঙ্কর সম্প্রদায়ের স্বাগত নৃত্যের ছন্দে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা হবে।

রেবিস রোগের উপর বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা

পশ্চিমবঙ্গ পশুচিকিৎসক সমিতির কলকাতা জেলা শাখার উদ্যোগে গত ৩০।১০।৮৭ আলিপুর পশুশালার প্রেক্ষাগৃহে ১দিনের আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। উদ্‌বোধন করেন মেয়র শ্রীকমল বসু। অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউটের অফ হাইজিনের অধিকর্তা ডাঃ বি এন ঘোষ সভাপতিত্ব করেন। বৈজ্ঞানিক আলোচনাচক্রে অংশ নেন পশুচিকিৎসা অধিকর্তা ডাঃ ফণীভূষণ কুণ্ডু, ডাঃ মণিষ চক্রবর্তী, ডাঃ ডিএন সেনগুপ্ত, ডাঃ হিরন্ময় ভট্টাচার্য, ডাঃ প্রিয়ব্রত সরকার প্রমুখ। 'জনস্বাস্থ্য' সংরক্ষণে বিভিন্ন টিকার ভূমিকা ও প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ডাঃ কুণ্ডু পশুচিকিৎসা অধিকারের কলকাতায় এই রোগ দমনে প্রয়াস ব্যাখ্যা করেন এবং অন্যান্য শহরেও যাতে এই কার্যধারা ভবিষ্যতে অবলম্বন করা যায় ব্যাখ্যা করেন। ডাঃ দীপেন পান্ডে, পশুচিকিৎসক সমিতির সম্পাদক বক্তব্য রাখেন। ডাঃ সুবোধ দে, মেয়র ইন্ কাউন্সিল পৌরসভার রেবিস দমন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। প্রায় ২৫০ জন পশুচিকিৎসক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। 'রেবিস' ও আধুনিক পশুচিকিৎসা পদ্ধতি নামক ২টি তথ্যচিত্র দেখান হয়।

চা-বাগান শ্রমিকদের ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা

পশ্চিমবংগ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ উত্তরবংগের চা-বাগানের শ্রমিকদের ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করেছে। শনিবার রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী শ্রীপ্রবীর সেনগুপ্ত সাংবাদিকদের এখবর দিয়ে বলেন, এ ধরনের উদ্যোগ এই প্রথম। তিনি বলেন, এজন্য অবশ্য চা-বাগানের ম্যানেজমেন্টের মতামত জানতে চাওয়া হবে এবং ম্যানেজমেন্টকেই বিদ্যুতের বিল আদায় করার দায়িত্ব নিতে হবে। আজই বিদ্যুৎ পর্ষদের এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক থেকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে ৪০,০০০ শ্রমিক কোয়ার্টারে আলো পৌঁছাবে।

তিনি বলেন, উত্তরবংগে কোন বিদ্যুৎ ঘাটতি নেই, তবে কোন কোন সময়ে কেবল যান্ত্রিক ত্রুটির জন্যই সরবরাহের সমস্যা দেখা দেয়। এক প্রশ্নোত্তরে তিনি বলেন, ১৩২ কেভি গ্রিড পাওয়ার ট্রান্সমিশন লাইন বসানোর কাজ আলিপুরদুয়ার হয়ে বীরপাড়া থেকে কোচবিহার পর্যন্ত হয়ে গেছে। এটা চুখা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে সমগ্র উত্তরবংগে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে। এছাড়াও জলপাইগুড়ির জেলার ময়নাগুড়িতে ১৩২ কেভি সাব-স্টেশন তৈরি হবে বলে তিনি জানান।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন, নিয়মিত তার চুরি বন্ধ করতে পাওয়ার ট্রান্সমিশন লাইনে অ্যালুমিনিয়াম তারের বদলে লোহার তার লাগানো হবে। সাধারণ মানুষের সহযোগিতায় এই ধরনের চুরি বন্ধ করা সম্ভবপর বলে তিনি উল্লেখ করেন। সেনগুপ্ত বলেন, শিলিগুড়ি ও তার সংলগ্ন এলাকার জন্য আমরা ৪৫ কোটি টাকার একটি জল সরবরাহ প্রকল্প তৈরি করেছি।

এটি এখনও কেন্দ্রের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। তিনি বলেন, দার্জিলিঙের পার্বত্য এলাকায় জল সরবরাহের জন্য ৩০২টি ক্ষুদ্র প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু জি এন এল এফ-র লোকজন এই প্রকল্পের পাইপ কেটে নিয়ে গিয়ে পাইপগান বানাচ্ছে। তিনি বলেন, জলপাইগুড়িতে ২০০টি রিগবোর টিউবওয়েল ও কোচবিহারে ৩২টি রিগবোর টিউবওয়েল বসানোর কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। শিলিগুড়ি ও নকশালবাড়িতে ইতিমধ্যেই এই ধরনের ৬০টি টিউবওয়েল বসানো হয়েছে।

শিক্ষা গণতন্ত্রীকরণ সংস্থার কনভেনশন

সর্বস্তরে দুর্নীতি দূরীকরণ, আইনের প্রশাসন প্রবর্তন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রাখার দাবিতে পশ্চিমবংগ শিক্ষাগণতন্ত্রীকরণ সংস্থার রবীন্দ্রভারতী শাখা আগামী সপ্তাহ থেকে পর্যায়ক্রমিক আন্দোলনে নামছে। সংস্থার শাখা-সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীসুনীল দত্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মরকত কুঞ্জে অনুষ্ঠিত সংস্থার কর্মসমিতির সম্প্রসারিত সভায় সম্প্রতি এই কথা ঘোষণা করে বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী প্রশাসনের নানা স্তরে দুর্নীতির জাল বিস্তার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কাজকর্ম বন্ধ করে দিতে সচেষ্ট হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী আধিকারিক হচ্ছেন রেজিস্ট্রার, কিন্তু তাঁকে পাশ কাটিয়ে আইনবিরুদ্ধভাবে নানা নির্দেশ জারি করা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে, কিন্তু হিসাব দাখিল করা হচ্ছে না। কোর্ট ও কাউন্সিলের নির্দেশ বেপরোয়াভাবে অমান্য করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক সমিতি ও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন কর্মীরা এই সব অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে এই স্বার্থান্বেষী মহল নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করার জন্য ছাত্রভর্তি, পরীক্ষাগ্রহণ, পঠন-পাঠন লাইব্রেরির কাজ বন্ধ করে দিতে সচেষ্ট হয়েছে। এটা এখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, প্রশাসনের উচ্চতম মহলের প্রশ্রয় না থাকলে এই স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী এতো বেপরোয়া হবার সাহস পেতো না। কিন্তু এই অবস্থা দীর্ঘদিন চলতে দেওয়া যায় না। এর প্রতিকার কল্পে পশ্চিমবংগ গণতন্ত্রীকরণ সংস্থার রবীন্দ্রভারতী শাখা প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে আগামী সপ্তাহে একটি কনভেনশনের আয়োজন করছে। ছাত্রনেতা রতন ভৌমিক ছাত্রছাত্রীদের নানা অসুবিধার কথা উল্লেখ করে জানায় যে, অব্যবস্থার প্রতিকারকল্পে ছাত্রসংসদ এই সপ্তাহ থেকে দুসপ্তাহের জন্য লাগাতার আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়েছে। কলাবিভাগের ডীন অধ্যাপক বিশ্বনাথ সেন তাঁর কোর্ট ও কাউন্সিলের অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ করে বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনব্যবস্থার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলি বন্ধ করে দিচ্ছে। কোর্ট, কাউন্সিল, ফিনান্স কমিটির মতো নির্বাচিত সংস্থাগুলির নিয়মিত বৈঠক হয় না। কদাচিৎ বৈঠক হলেও দরকারি কাগজপত্র সরবরাহ করা হয় না। টাকা-পয়সা খরচ ও লোক নিয়োগের ব্যাপারেও সরকারি নির্দেশ বেপরোয়াভাবে লংঘন করা হয়। এই পরিস্থিতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক অগ্রগতির পক্ষে ক্ষতিকর। এর প্রতিকারের জন্য গণতন্ত্রীকরণ সংস্থাকে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র এবং বর্তমানে কোর্ট ও কাউন্সিল সদস্য শ্রীনীতীশ বিশ্বাস কোর্ট, কাউন্সিল ও বিভিন্ন কমিটিতে তাঁর দুঃখজনক অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন, একমাত্র সংগঠিত আন্দোলনের মাধ্যমেই এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করা সম্ভব। এরপর কোর্ট সদস্য অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত, কলাবিভাগীয় শিক্ষক সমিতির সম্পাদক অধ্যাপক নির্মল দাশ এবং কর্মীদের প্রতিনিধি মানিক বসাক আন্দোলনের সপক্ষে বক্তব্য রাখেন। সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক কৃষ্ণনাথ চট্টোপাধ্যায় দুর্নীতির মূলচ্ছেদ করার সর্বাত্মক আন্দোলনের আহ্বান জানান।

এদিকে বিশ্বস্ত সূত্রের খবর এই যে, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে আইনভংগের বিষয়গুলি তদন্ত করে দেখার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাক্টের ৪৪(৩) ধারা অনুসারে যে শ্রীপ্রতীপ চৌধুরী কমিটি গঠিত হয়েছিল, সম্প্রতি সেই কমিটির রিপোর্ট রাজ্য সরকারের অভিমত সহ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয়েছে এবং এই অভিমত সম্পর্কে কোর্ট ও কাউন্সিলের অভিমত একমাসের মধ্যে রাজ্য সরকারের কাছে পাঠাতে বলা হয়েছে।

স্বল্পসঞ্চয় অভিযানে মালদা

পশ্চিমবংগের বামফ্রন্ট সরকার গত ১০ বছর ধরে স্বল্প সঞ্চয়ের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। এই নীতির সংগে সংগতি রেখে মালদা জেলাতেও স্বল্পসঞ্চয় প্রকল্পকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সম্প্রতি দেখা করেছিলাম মালদা জেলা স্বল্পসঞ্চয় বিভাগের সহ-অধিকর্তা শ্রীশ্যামল কুমার ভট্টাচার্যের সংগে। কথা প্রসংগে তিনি পরিসংখ্যান দিয়ে জানালেন যে গত বছর (৮৬-৮৭ সালে) স্বল্প সঞ্চয় খাতে মালদা জেলায় মোট ৩,৯৬,৮৭,৯২৫ টাকা সংগৃহীত হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪.৭৫ কোটি টাকা। প্রসংগত আরও জানালেন যে, এ বছরে (৮৭-৮৮ সাল) সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত স্বল্পসঞ্চয় খাতে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ২ কোটি ৬১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৮৬৯ টাকা, লক্ষ্যমাত্র ধার্য করা আছে ৫.৭৫ কোটি টাকা। এই মহতী কাজে ২২১ জন এম.এ. এস এজেন্ট ও ৭ জন মহিলা এজেন্ট নিযুক্ত আছেন। তিনি দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বললেন যে সঞ্চয়কে নিরাপদ করে তুলতে এবং রাজ্যের উন্নয়নের কাজকে ত্বরান্বিত করতে জেলা স্বল্পসঞ্চয় বিভাগ সকল স্তরের মানুষের সহযোগিতা নিয়ে লক্ষ্যমাত্র পূরণে সক্ষম হবেই।

পশ্চিমবঙ্গে সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতি

শ্রী ভক্তিভূষণ মন্ডল

সমবায় মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জীবনের নানা ক্ষেত্রে সমবায় আন্দোলনের অগ্রগতির ফলে সমবায় শব্দটি আজ ঘরে ঘরে অতি পরিচিত। বর্তমানে এ রাজ্যে সমবায় আন্দোলনের আওতায় বাস করছেন প্রায় ৭০ লক্ষ পরিবার। "সর্বজনীন সদস্যপদ কর্মসূচি" বলে গ্রামের মানুষের দরিদ্রতর অংশকে ১ কোটি ৪০ লক্ষের মত টাকা অনুদানের মাধ্যমে প্রায় ৭ লক্ষ ৬০ হাজার পরিবারকে সদস্যপদ দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

সমবায়গুলি এক অতি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ, অর্থাৎ কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য কৃষিজীবীদের ঋণ সরবরাহ করে। ১৯৮৬-৮৭ সালে ১০ লক্ষ ৭০ হাজার কৃষিজীবীদের মধ্যে প্রায় ৫২ কোটি টাকা বিলি করা হয়েছে। টাকা যাঁরা পেয়েছেন তাঁদের অধিকাংশই দরিদ্রতর শ্রেণীভুক্ত। সমবায় বিপণন সমিতি এবং গ্রামের প্রাথমিক কৃষি সমবায় ঋণদান সমিতিগুলির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ বিলি করেছে, সেটি হলো রাসায়নিক সার–পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ২ লক্ষ ৪৮ হাজার মেট্রিক টন সার, অর্থাৎ এরাজ্যে বন্টিত মোট সারের প্রায় ২৭ শতাংশ বিলি করা হয়েছে। গ্রামের মানুষের বিনিয়োগ ঋণের চাহিদা মেটায় সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলি। ১৯৮৬-৮৭ সালে তারা প্রায় ২১,০৫০ সদস্যের মধ্যে প্রায় ১১ কোটি টাকা বিলি করেছে। এই টাকার প্রায় ৬০ শতাংশ ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হয়েছে। ৭২,০০০ মাছ চাষীকে ১৯৮৬-৮৭ সালে প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা মেয়াদী ঋণ দেওয়ার ফলে তাঁরাও উৎসাহিত হয়েছেন। এরাজ্যে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল হলো পান। ১৯৮৬-৮৭ সালে ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলি পান চাষের জন্য ঐ চাষীদের প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়েছেন।

ফসলের উৎপাদন বাড়লে চাষীরা যাতে ন্যায্য দাম পান সমবায়গুলিকে সে জন্য হস্তক্ষেপ করতে হয়। এক্ষেত্রেও রাজ্যের সমবায় সমিতিগুলি জুট কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ার তত্বাবধানে ১৯৮৬-৮৭ সালে উৎপাদকদের কাছ থেকে প্রায় ৫ লক্ষ ৯৫ হাজার গাঁট পাট সংগ্রহ করেছে। তার দাম ৩০ কোটি টাকা। প্রায় ১ লক্ষ ২৬ হাজার মেট্রিক টন মজুত করার ক্ষমতা সম্পন্ন ৩৫টি সমবায় হিমঘরে আলু চাষীরা বাজারে আলুর অঢেল সরবরাহের সময় আলু মজুত রাখতে পারছেন। ৩২ হাজার মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন আরও ৮টি হিমঘর শীঘ্রই চালু হবে।

রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে গুদামজাতকরণের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা নেই। বিশ্বব্যাঙ্কের সাহায্যপ্রাপ্ত জাতীয় সমবায় উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রকল্পের অধীনে সমবায় ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি গুদাম তৈরি হয়েছে। এর ফলে ১,৫২৪ টি সমবায় গুদামে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার মেট্রিক টন কৃষিজাত ও অন্যান্য পণ্য বর্তমানে সংরক্ষণ করা যায়। আগামী ৪ বছরে আরও ৭৩০টি গুদাম নির্মিত হতে চলেছে যেখানে আরও ১ লক্ষ ৭৫ হাজার মেট্রিক টন পণ্য রাখা যাবে। সমবায় ক্ষেত্রে অধুনা কৃষিজাত পণ্যের প্রক্রিয়ায়ণের সুযোগ-সুবিধাও রয়েছে; বর্তমানে ৯৯টি পাটের গাঁট তৈরির কারখানায় প্রায় ৪০,০০০ মেট্রিক টন পাট থেকে গাঁট তৈরি হচ্ছে।

শহরাঞ্চলে আবাসন সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এসেছে সমবায় আবাসন সমিতিগুলি। এ পর্যন্ত ১৯,৩০০ ফ্ল্যাট তৈরি হয়েছে যার বেশির ভাগই মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্তদের জন্য।

তাঁতিদের সারা বছর কাজ পাওয়ার সমস্যা আছে। কিন্তু তন্তুজীবী সমবায় সংগঠন সে সমস্যা অনেকটা লাঘব করেছে। বর্তমানে এই সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ১ লক্ষ ২০ হাজার। এই সমবায়গুলির তৈরি তাঁত বস্ত্রের বিক্রয়মূল্য প্রায় ১২২ কোটি টাকা; দরিদ্র তাঁতিদের বারো মাসই কিছু না কিছু কাজের সুযোগ থাকে এই সমবায়গুলির মাধ্যমে। আদিবাসী জীবনেও আজ সমবায়ের গুরুত্ব অনেকখানি। রাজ্যের ৭৯টি ল্যাম্পস সংস্থা যার প্রায় ১০০% সদস্যই আদিবাসী, মোটামুটি ৭৩ লক্ষ টাকার বনজ সম্পদ আহরণ করেছে।

তবুও এ রাজ্যে সমবায় আন্দোলনকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে। সমিতির সদস্যদের, সমিতিগুলির কর্মচারীদের এবং রাজ্য সরকারের ঐকান্তিক প্রয়াস সমবায় সমিতিগুলির ভূমিকাকে সফল করে তোলার ক্ষেত্রে, সদস্যদের নিরন্তর সুফল পাওয়ার ক্ষেত্রে একান্ত জরুরী।

উপরিউক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামীণ প্রলেতারিয়েতদের সুবিধার্থে আমরা সমবায় আন্দোলন নিয়ে চিন্তাভাবনা করছি। আমরা সমবায় আন্দোলনকে একদম নিম্নস্তর অর্থাৎ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি ও প্রাথমিক সমিতিগুলি থেকেই জোরদার করার চেষ্টা করছি। প্রাথমিক কৃষি সমবায় ঋণদান সমিতি ও প্রাথমিক সমিতিগুলিকে শক্তিশালী না করলে সমবায় আন্দোলন উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গিতে আশানুরূপ এগোতে পারবে না। অতএব আমাদের পশ্চিমবঙ্গে সাত হাজার প্রাথমিক সমিতির প্রকৃত অবস্থা খতিয়ে দেখতে হবে। জনগণই সেগুলির লালন পালন ও কাজকর্ম বৃদ্ধি করতে পারেন। সমবায় আন্দোলনের স্বার্থেই এই কাজ করতে হবে। শুধুমাত্র এপেক্স ও কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিগুলির উন্নতির বিষয়ে বিচার বিবেচনা করলেই সমবায় আন্দোলন শক্তিশালী হবে না। কেবলমাত্র প্রশাসনিক উপায়েই সমবায় আন্দোলনকে জোরদার করা যাবে না, এর জন্য চাই জনসমর্থন। সমবায় আন্দোলনের উন্নতি বিধানের জন্য আরো রাজনৈতিক দলমত নির্বিশেষে কিছু সৎ ব্যক্তির সাহায্য চাই। সমবায় আন্দোলনের মূল অবলম্বন হলো সমবেতভাবে চিন্তাভাবনা এবং এ ব্যাপারে সাধারণ সদস্যদের মতের মিল হওয়া প্রয়োজনীয়। জনগণকে প্রাথমিক সমিতিগুলির ব্যাপারে উৎসাহিত করা গেলে তা সমবায় আন্দোলনের পক্ষে কল্যাণকর হবে। শ্রম সমবায় ও অন্যান্য সমবায়ের মাধ্যমে দরিদ্রতম ব্যক্তি ও গ্রামের মানুষদের বেকার সমস্যা কিছু পরিমাণে সমাধান করা যেতে পারে। সমবায় আন্দোলনকে উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিতে হবে। সমবায় সপ্তাহের এই দিনে আমরা উপরিউক্ত দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সমবায় আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। যথাসময়ে উপযুক্ত পর্যায়ে সমবায় আন্দোলনকে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপমুক্ত করা হবে।

সমবায় আন্দোলন দীর্ঘজীবী হউক।

সমবায় আন্দোলনে নতুন চিন্তা

শ্রী রথীন্দ্রনাথ দে

সমবায় সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পশ্চিমবঙ্গে সমবায় আন্দোলনের শুরু সুন্দরবনের গোসাবায়। সেখানে ১৯১৬ সালে হ্যামিল্টন সাহেব ১৫ জন সদস্যকে নিয়ে প্রথম সমবায় সমিতি তৈরি করেন। গত ৭০ বছরে সমবায় এ রাজ্যে গ্রামীণ জীবনের একটি অংগে পরিণত হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে কৃষিঋণ, ভূমিউন্নয়ন ঋণ, ভোগ্যপণ্য ও সার বিতরণ, গুদামঘর ও হিমঘর নির্মাণ ও পরিচালনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমবায়ের সাফল্যের পরিমাণগত হিসাব এই পৃষ্ঠায় অন্যত্র দেওয়া হয়েছে। গুণগত ক্ষেত্রের কয়েকটি কথা কেবল বলছি। গত কয়েক বছরে সর্বজনীন সদস্যকরণ প্রকল্পে গ্রামের দুর্বলতম শ্রেণীর ৭ লক্ষ ৬০ হাজার ব্যক্তি ৫০ টাকা হিসাবে সরকারি অর্থ সাহায্য নিয়ে সমবায় সমিতির সদস্য হয়েছেন। ফলে সমিতিগুলির দৃষ্টিভংগির বেশ খানিকটা পরিবর্তন হয়েছে। কৃষিঋণের লগ্নি ৪৩ কোটি থেকে গত বছরে ৫২ কোটি টাকা, দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ ৮ কোটির স্থানে সাড়ে দশ কোটি টাকা হয়েছে। এগুলি উল্লেখযোগ্য। তবে এ রাজ্য বেশ কিছু অনাদায়ী ঋণের দায়ে NABARD এর অর্থসাহায্য পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারছে না। সমবায় ঋণ শোধ করলে আরও বেশি ঋণ পাওয়া যায়—এই বিশ্বাস সকলের মধ্যে আনতে হবে। এ জন্যে রাজ্য সরকার সমবায়ে কাজের সংগে পঞ্চায়েতের আরও ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ চাইছেন। বর্তমান সমবায় আইন ১ আগস্ট থেকে চালু হয়েছে, এই আইনে পঞ্চায়েত থেকে সমবায় সমিতির পরিচালকমণ্ডলীতে একজন সদস্য নেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

নতুন কাজকর্ম নিয়ে কয়েকটি কথা। সমবায় ভূমিউন্নয়ন ব্যাংক এখন বৃক্ষ রোপণের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণের মাধ্যমে পতিত জমি উদ্ধারের কাজে নেমেছে। গত বছরে এ কাজ হয়েছে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম, দার্জিলিং ও পুরুলিয়ার গ্রামাঞ্চলে। আগামী বছরের মধ্যে এসব অঞ্চলে বৃক্ষরোপণে ৪৩ লক্ষ টাকা লগ্নি করার প্রকল্প NABARD অনুমোদন করেছেন। ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক এখন থেকে অকৃষি কাজ অর্থাৎ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পকে সাহায্য করতে পারবে। এ জন্যে ২২টি শিল্পকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

এ রাজ্যের ৭০০টি শ্রমিক সমবায়ের ৭৯টি হলো উপজাতিদের নিয়ে গঠিত LAMPS। LAMPS গুলি গত বছরে ৭২ লক্ষ টাকা মূল্যের বনজাত সামগ্রী—কেন্দুপাতা, শালবীজ সংগ্রহ করেছে। সুখের কথা গত কয়েক বছরে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া অঞ্চলে বনে কাঠ কাটার কাজও LAMPS দের দেওয়া হচ্ছে। এই সমিতিগুলির আর্থিক অগ্রগতিতে এই ব্যবস্থা সাহায্য করবে। সম্প্রতি সরকার শ্রমিক সমবায়কে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ৫০,০০০ টাকা মূল্যের মাটির কাজ সমবায়কে দেওয়া হবে। এগুলি যথাযত ব্যবহার হলে শ্রমিক সমবায়ের আর্থিক উন্নয়ন সম্ভব। তবে শ্রমিক সমবায়ের সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যাপারে পঞ্চায়েতকে আরও এগিয়ে আসতে হবে।

সমবায়ের মাধ্যমে উন্নয়নের একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত হলো বর্ধমান শহরের অনতিদূরে শ্রীধরপুর গ্রাম। শুরু সমবায় ব্যাংক নিয়ে। নিজস্ব তহবিল গড়বার জন্য সভ্যদের একটি করে বাক্স দেওয়া হয়। চাবি থাকত সম্পাদকের কাছে। সপ্তাহে একদিন সভ্যদের বাড়ি গিয়ে সম্পাদক বাক্স খুলে অর্থ সংগ্রহ করতেন। এইভাবে স্বল্প-সঞ্চয়ের মাধ্যমে তহবিল তৈরি হয়। ১৯৩৯ সাল থেকে সমিতি স্বাবলম্বী হয়েছে। এরপর ক্রেতা সমবায় ভাণ্ডার তৈরি হয়। আসে শস্যগোলা। সদস্যরা প্রতি বছরে কিছু ধান জমা রাখেন। চাষের সময়ে ছয় মন অবধি ধান ঋণ দেওয়া হয়। ধান কাটার পর তা শোধ দিতে হয় শতকরা ১৫ ভাগ সুদ সমেত। আস্তে আস্তে দুটি গুদামঘর তৈরি করে সার বিক্রয় শুরু করা হয়। ১৯৭৮ সালে আলু চাষীদের সুবিধার জন্য হিমঘর নির্মাণ করা হয়। হিমঘরে আলু জমা রেখে সদস্য মূল্যের শতকরা ৬০ ভাগ ঋণ হিসাবে পান। সময়মত আলু বিক্রয় করে ধার শোধ দেন। শ্রমিকরা বাসনপত্র বন্ধক রেখে শতকরা ৮ ভাগ সুদে মূল্যের শতকরা ৮০ ভাগ পর্যন্ত ঋণ পাচ্ছেন। ভূমিহীন কৃষকদের স্বার্থে একটি দিঘি কিনে মৎস্যচাষের ব্যবস্থা হয়েছে। সমবায় সমিতি কেবল অর্থনৈতিক কাজ করেই সন্তুষ্ট হননি। সেখানে সমাজ কল্যাণ কেন্দ্রে সন্ধ্যায় টি ভি দেখা যায়। লাইব্রেরী, খেলাধুলা, দাতব্য তহবিল ইত্যাদিও তৈরি হয়েছে।

সমবায়ের মনোভাব নিয়ে গ্রামীণ উন্নয়ন সম্ভব এটি প্রমাণ করেছে শ্রীধরপুরের গ্রামবাসীরা। সমিতির বর্তমান কার্যকরী মূলধন ১২৮ লক্ষ টাকা। এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা সম্ভব। সরকারও এ ব্যাপারে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে প্রাথমিক সমিতির উন্নয়নের কতকগুলি বিশেষ প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। প্রাথমিক সমিতির সাফল্যের উপরেই সমবায়ের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।



গত ২২ সেপ্টেম্বর যাদবপুরের গড়ফা সংস্কৃতিচর্চা সভাগৃহে 'মিত্রায়ণ' সংস্থা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ডঃ মহুয়া মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সুকান্ত'র 'অভিযান' নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে। নেপথ্য সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায়।

উনবিংশ শতকের পাঁচালীগান

শ্রীমতীগৌরী ভট্টাচার্য

বাংলা দেশের অষ্টাদশ উনবিংশ শতকের রাষ্ট্রবিপ্লব ও সাহিত্য বিবর্তনের মধ্যে এক আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে সাড়ে পাঁচশ বৎসরের পুরোনো ও জীর্ণ মুসলমান রাজশক্তির অবসানের এবং ব্রিটিশ রাজশক্তির অভ্যুদয়ের যে সূচনা হয়েছিল তা পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছিল ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতায়।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ এই একশ বৎসর বাংগালীর রাজনৈতিক, সামাজিক জীবন ছিল ঘোর অনিশ্চয়তার মধ্যে। এই শত বৎসরের প্রথমার্ধে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে বাংগালী জাতি বিভিন্ন উৎপীড়ন ভোগ করেছে। রাজস্ব আদায়ের নবনীতিতে ভূস্বামীগণের বিলুপ্তি, নতুন জমিদারগোষ্ঠীর হাতে প্রজাদের দুঃসহ নির্যাতন, কোম্পানীর কর্মচারীদের লোভ ও অসাধুতায় ন্যায়বিচারের অবলোপ, নিরাপত্তার অভাব–সব মিলিয়ে এই সময় বাংগালীদের জীবনে এক অসাহয়তার সৃষ্টি করেছিল।

এই রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা সাহিত্যক্ষেত্রেও প্রবেশ করেছিল। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুকাল হতে আরম্ভ করে গুপ্তকবির মৃত্যুকাল পর্যন্ত–এই একশ বৎসরের কালকে বাংলা সাহিত্যের রাত্রিকালও বলা যেতে পারে।

মানুষ শুধুমাত্র খাদ্যগ্রহণ করেই বাঁচে না, তার মনের খোরাকও চাই। এই একশ বৎসরের চরম দুর্দশার মধ্যে তাঁদের হৃদয়ক্ষুধা মেটাবার জন্য তাঁরা শিল্প সাহিত্যকে ত্যাগ করতে পারেন নি। বাংলা সাহিত্যকালে যখন রাতের অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনিয়ে আসছে তখন তার মধ্যে অনেক ছোটবড় নক্ষত্র ক্ষীণ হয়ে জ্বলছিল, সে রাতে তার জন্য কিছু কম ছিল না। সে সময়ে কবিগান, তরজা, কীর্তন, ঢপ, পাঁচালী, যাত্রা, খেউড়, আখড়াই, হাফ আখড়াই, ঝুমুর, টপপা প্রভৃতি বাংগালীমনের ক্ষুধা ও রসের তৃষ্ণা মিটিয়েছিল। সেজন্য অনেকেই এই যুগটাকে 'গানের যুগ' বলে অভিহিত করেছেন। আবার কেহ কেহ এই যুগকে 'কবিওয়ালার যুগ'ও বলেছেন।

মধ্যযুগের নাটমঞ্চে কি চণ্ডীমণ্ডপে মংগলকাব্য যে সুর-লয় সহযোগে গাওয়া হোত তা পাঁচালীর সুর। পয়ার ছন্দের মত পাঁচালীর সুর বাঙালীর অতি পরিচিত। এ প্রসংগে ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় বলেছেনঃ–"বৈষ্ণব পদাবলীর কথা বাদ দিলে পুরাতন বাংগালা সাহিত্যের প্রায় সব রচনাই পাঁচালী কাব্য কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে ভারতচন্দ্রের অন্নদামংগল পর্যন্ত।"

পাঁচালী কোন সময় হতে প্রচলিত হয়েছিল তা সঠিক বলা যায় না। পাঁচালী দুভাগে ভাগ করা যায় প্রথমতঃ পৌরাণিক পাঁচালী অর্থাৎ সংস্কৃত পুরাণ সাহিত্য থেকে অনুবাদ করা সমস্ত কাহিনী যেমন রামলীলা পাঁচালী, কৃষ্ণলীলা পাঁচালী, মহাভারত পাঁচালী। এবং দ্বিতীয়তঃ লৌকিক পাঁচালী অর্থাৎ দেশীয় কাহিনী অনুসরিত যে সব পাঁচালী যেমন মনসার পাঁচালী, ধর্মঠাকুরের পাঁচালী, মংগলচণ্ডীর পাঁচালী। তাছাড়া প্রণয়কাহিনীযুক্ত আদিরসে ভরপুর যে সমস্ত পাঁচালী তার মধ্যে পড়ে বিদ্যাসুন্দর পাঁচালী, দৌলত কাজীর লোর চন্দ্রানী, আলাওলের পদ্মাবতীর পাঁচালী ইত্যাদি।

পাঁচালী কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিয়ে নানাজনের নানান মত। অনেকে মনে করেন পাঁচমিশালী থেকে পাঁচালী কথাটি এসেছে। খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় এ সম্পর্কে বলেছেন পঞ্চ+আলি পাঁচালী অর্থাৎ পঞ্চ সম্বন্ধীয় তাই পাঁচালী। ঠাকুরালি, ঘটকালি, ভাবকালি শব্দগুলির মত একই প্রণালীতে এই শব্দের উৎপত্তি হয়েছিল।

শ্রী ধর্মানন্দ মহাভারতী 'পাঁচালী' শব্দটির একটি নতুন ব্যাখ্যা করে বলেছেন পাঁচালী শব্দটির পশ্চিমবংগ রাঢ়দেশে উৎপত্তি, পূর্ববংগে উচ্চারণ-দোষে সংস্কৃত 'পঞ্চ' শব্দ 'পাশ' এবং পশ্চিমবংগে 'পাঁচ' বলে উচ্চারিত হয়। আলি শব্দ ভ্রমর। বাংগালায় বরেয়ারী শব্দ বারোয়ারী বলে উচ্চারিত হয়। বরেয়ারী হিন্দি শব্দ অর্থাৎ বারজন ইয়ার বা এয়ার, বন্ধু বা গ্রামবাসী একত্র মিলে যে কাজ করে তাই। গ্রামের মাতব্বর প্রধান পাঁচজন মানুষ মিলে যা করে তাই পাঁচালী কার্য বলে গণ্য করা হয়।...... অতি পুরাকাল থেকেই রাঢ় দেশে গ্রামের প্রধান প্রধান মণ্ডল, মাতব্বর লোক ও প্রধানেরা আলি, ভ্রমর, মক্ষিকা বলে সম্বোধিত হয়ে আসছেন। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম জেলার অনেকের বংশগত উপাধি আলি, ভোমরা ইত্যাদি। কাশীদাসের পূর্বে ও তাঁর সময়ে বারোয়ারী লোকেরা পাঁচালী বলে গণ্য হতো। তাঁরা ছড় গাইতেন, সং সেজে নাচ ও তামাসা করতেন। তরজা বা ঝুমুরের মত পয়ার ছন্দে গালাগালি করতেন, কিন্তু তারা পাঁচালী গ্রন্থ লেখেন নি অথবা দাশুরায়ের মত পাঁচালী প্রথাও তাঁরা জানতেন না। পাঁচালী বলে কোন গ্রন্থ সে সময়ে ছিল না, তাঁদের অধিকাংশই মুখে মুখে বিরচিত হোত এবং তাই গান করা হোত। ক্রমে পাঁচালী পুস্তকাকারে এসে পৌছল।

কারো কারো মতে পাঁচালী শব্দ পা চালি বা পদ চালন হতে এসেছে। মূল গায়ের পদ চালনা করতে করতে এই গান করতেন বলে এর পাঁচালী।

আরো অনেকের মতে পাঁচটি অংগবিশিষ্ট বলে অর্থাৎ গান, সাজ বাজানো, ছড়া কাটান, গানের লড়াই ও নাচ–এই পাঁচটি অংগের জন্য এর নাম পাঁচালী। (২)

অনেকে মনে করেন পঞ্চালী একটি বিশিষ্ট ছন্দের নাম। প্রাকৃতে ও পঞ্চাল ছন্দ ছিল। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে পাঞ্চালী বলে একটি রীতির নাম উল্লিখিত আছে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে "পাঁচালী প্রবন্ধে" পাঁচালীর ছন্দে, পাঁচালীর গাথা প্রভৃতি প্রয়োগ দেখে পাঁচালী অর্থে একটি বিশেষ ধরনের বা ছাঁচের কথাই মনে আসে। অর্থাৎ পাঁচালী গাইবার একটি বিশেষ রীতি ছিল সে কথাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু কি করে শব্দটির উৎপত্তি হলো এবং বাংলা সাহিত্যে গৃহীত হলো, এর উৎপত্তি ও পরিণতির সাদৃশ্য কোথায় সে কথার সঠিক জবাব মেলা ভার।

কৃষ্ণমংগল, শিবমংগল, রামমংগল, চণ্ডীমংগল, মনসামংগল, ধর্মমংগল প্রভৃতি মংগলগানগুলির পাঁচালীর সুরে গীত হয়। পদাবলীর সংগে এর সাধারণ পার্থক্য পদাবলী সমধ্রুবা, পাঁচালী বিষমধ্রুবা। মংগলগান দোহারগণ বার বার ধুয়া আবৃত্তি করে। পদাবলীতে সেরূপ রীতি নেই। পদাবলীতে নানাবিধ সুর ও রাগরাগিনীর প্রয়োগ আছে। পাঁচালী প্রভৃতি গানে, সম, অর্ধসম, বিষম এরূপ ভেদও কথিত হয়।

পাঁচালীর কথা উঠলেই দাশুরায়ের কথা সর্বাগ্রে মনে পড়ে। দাশু রায়কে পাঁচালী গানের প্রবর্তক বললেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু দাশরথির পাঁচালী সংগীত শাস্ত্রের নিয়মে রচিত নয়। তাল এবং সুর থাকলেও দাশরথির গানে উদ্‌গ্রাহক, মেলাপক–আদি ধাতুর কোন বালাই নেই। দাশুর পাঁচালীতে এক একটি ছড়া, তার পরে গান আছে। ছড়া সুর করে আবৃত্তি করতে হয়। গানগুলি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সুর করে গাইতে হয়।

পূর্বে কবিগানে ছড়া আবৃত্তি করবার গান এবং গাইবার রীতি ছিল, মংগলগানের মধ্যে ছড়া নেই আছে গান, পয়ার এবং আবৃত্তি আর মাঝে

□ (শেষাংশ ৪০২ পৃষ্ঠায়)



ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব, বিস্তৃত পশ্চাৎভূমি সেবিত বন্দর, প্রাকৃতিক প্রাচুর্য ও কারিগরি নৈপুণ্যের আনুকূল্য সত্ত্বেও পরাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গ অভিলষিত শিল্প সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারেনি। বিভিন্ন সময়ে নানা ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অসহযোগিতা ও পক্ষপাতমূলক শিল্পনীতির ফলেই এ রাজ্যের শিল্প-প্রসারের গতি মন্থর হয়ে পড়ে। মাশুল সমীকরণ নীতি বিশেষ করে এ রাজ্যের শিল্পক্ষেত্রে বিপর্যয় নিয়ে আসে। ভারতবর্ষ মূলত কৃষিনির্ভর হলেও শিল্পের উন্নতি ছাড়া আধুনিক যুগে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অভিপ্রায়-পত্রের অনুমোদন ও আর্থিক সংস্থানের বিভিন্ন পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা ছাড়া বৃহৎ শিল্প স্থাপন অসম্ভব। এই প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে বর্তমান রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনে অধিষ্ঠিত হবার পর থেকেই এ রাজ্যের শিল্পোন্নয়নের দিকে, বিশেষ করে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে নজর দিয়েছে। কারণ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার ছাড়া এরাজ্যের বেকার সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। কিন্তু কুটির শিল্পই হোক বা ক্ষুদ্র শিল্পই হোক–তার উদ্যোগের সাফল্য অর্জনে বিভিন্ন সংস্থা ও পরিকাঠামোর সহযোগিতা প্রয়োজন।

রাজ্য সরকারের বাংলা সাপ্তাহিক মুখপত্র পশ্চিমবঙ্গ, সেক্ষেত্রে তাঁর কর্তব্যের কথা মনে রেখেই, এই বিভাগের প্রবর্তন করছে। দীর্ঘদিন যাবৎ শিল্পোন্নয়ন গবেষণারত এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ প্রযুক্তিবিদ্‌গণ এই বিভাগে নিয়মিত নিবন্ধ প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তাঁরা শিল্প গড়ার তথ্যের পরিবেষণে শুধু যে অভিজ্ঞতাই নয়, পারদর্শীও বটে। সাধারণ পাঠক এবং যেসব যুবক-যুবতী শিল্প গড়তে আগ্রহী তাঁরা সকলেই এই বিভাগটিতে ক্রমপ্রকাশমান নিবন্ধগুলি পাঠে উপকৃত হবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। –সম্পাদক

উদ্যোগ ভাবনার সমীপে–প্রথম পর্ব

গত সংখ্যায় আমরা জেনেছি ক্ষুদ্র শিল্প কোনগুলো ও তার নানা দিক। এছাড়া নতুন শিল্প, যদি ক্ষুদ্র শিল্প হয়, তবে প্রথম যোগাযোগের স্থান জেলা শিল্পকেন্দ্রগুলোর নাম, ঠিকানা ইত্যাদি। এবারে আমরা ভাবব জেলা শিল্পকেন্দ্র সম্পর্কে, ভাবব সেখানে যাবার আগে ও যাবার পর কি করব সেই সম্পর্কে।

জেলা শিল্পকেন্দ্রে যোগাযোগের আগে কি করবেন ?

আগে আলোচনা করলেও একটা কথা আবার বলছি। কোথাও কোনপ্রকার সহায়তা, সহযোগিতা বা পরামর্শ পেতে গেলে আগে একটা প্রস্তুতি নেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যজনক হলেও অতীত অভিজ্ঞতা থেকে একটা কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি। খুব সামান্য সংখ্যক শিল্পোদ্যোগীই এই প্রস্ততি সমাপ্ত করে সাহায্যের জন্যে আসেন। তার ফলে কি হয় ? যিনি সহযোগিতা করতে চান তাঁকে প্রথম বুঝতে চেষ্টা করতে হবে যিনি সহযোগিতার জন্য বা সহায়তার জন্য তাঁর কাছে এসেছেন তিনি আসলে কি চান। আর একটু স্পষ্ট করেই বলা যাক। যিনি এসেছেন তিনি কি 'স্কীম' করাতে চান, নাকি 'মডেল স্কীমের' থেকে একটা 'স্কীম' বেছে নিতে চান ? তাঁর কি কোন 'স্কীম' সম্বন্ধে জানা আছে ? কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে তাঁর কোন শিক্ষাগত যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতা প্রভৃতি আছে কি? কেন তিনি শিল্পোদ্যোগী হতে চাইছেন তার যুক্তিযুক্ত কোন কারণ আছে কি ? তাঁর আর্থিক সংগতি কতটা ? এই ধরণের অনেকগুলো বিষয় সম্পর্কে পুরোপুরি জানা না হলে কারো পক্ষেই পরামর্শ দেওয়া, সহায়তা করা সম্ভব নয়। আর যিনি এসব কিছুই না জেনে সহায়তা করবার চেষ্টা করবেন তাঁর চেষ্টাও সফল হবার সম্ভাবনা কম।

যদি আগে থেকে সব ঠিকমত জানা বা বোঝা না থাকে তাহলে কি হবে ? দক্ষ ও সুযোগ্য জেলা শিল্পকেন্দ্রের কর্মী আপনার কাছে এই সব বিষয়ে জানতে চাইবেন। না জানানো পর্যন্ত কোন কিছু এগোবে না। আপনি বার-বার নানা কারণে শিল্প কেন্দ্রে ঘুরবেন আর ভাববেন কেউই প্রকৃতপক্ষে আপনাকে সহায়তা করছে না। অথচ সহায়তার উপযুক্ত না হলে সহায়তা পাওয়া বা করা সম্ভব নয়। এটা আগে ঠিকমত না জানার দরুনই আপনার এই ভোগান্তি। এই সত্যটি শিল্পোদ্যোগীদের বুঝতেই হবে।

শিল্প গড়ার কাজে নামার কারণ :

এবার প্রস্তুতি নেবার বিষয়টা গোড়া থেকে ভাবা যাক। প্রথম আপনি কি ঠিক করেছেন বলুন তো ? ঠিক করেছেন–কোনোরকম চাকরী করবেন, না কেনাবেচার ব্যবসা করবেন, না শিল্প গড়বেন ? নিশ্চয় আপনার নিজের কাছে যুক্তিযুক্ত চিন্তাভাবনার ভিত্তিতে আপনি ঠিক করেছেন যে আপনি শিল্প গড়বেন। ভেবে দেখুন যার বদলে আপনি শিল্পগড়ার কাজে নামছেন সেগুলো কি। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে সফলতা অর্জন করতে পালে কেরানী থেকে শুরু আই.এ.এস পর্যন্ত হওয়া যায়। এছাড়া নানান বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষানবীশ থাকার মাধ্যমেও চাকরী মেলে। এসবে ঝুঁকি অনেক কম, বিশেষ করে আর্থিক ঝুঁকি। এই ধরনের প্রচেষ্টা ত্যাগ করে আপনার শিল্প গড়ার ভাবনাটা প্রাধান্য পেল কেন ? এখানে একটা বলা দরকার। চাকরী প্রভৃতির ব্যাপারে যা বললাম সেটাই সব নয়। অহেতুক বেশি না বলে ঐ দিকটার ইঙ্গিত করা হল মাত্র।

যাই হোক, যেটা নিজের কাছেই স্পষ্ট হওয়ার দরকার সেটা হল, শিল্প গড়তে উৎসাহী হবার প্রকৃত কারণ। ঝোঁকের মাথায় যদি কিছু ঠিক করা হয়

তাতে ফল লাভ করা শক্ত। সেজন্য এই কারণটা নিজেই যদি নিজের কাছে জানতে চান তাতেই সমস্ত ব্যাপারটা পরিস্কার হয়ে যাবে।

এখানে বলে রাখি শুধুমাত্র সরকারী বিজ্ঞাপন আর বিভিন্ন আর্থিক সাহায্য, 'ইনসেনটিভ' ইত্যাদির প্রলোভন যদি আপনাকে শিল্পোদ্যোগী হতে উদ্বুদ্ধ করে থাকে তাহলে এখনই সাবধান হওয়া ভাল। কারণ যাঁরা যেন তেন প্রকারেণ সরকারী টাকা বা ব্যাঙ্কের টাকা বের করে আত্মসাৎ করার চেষ্টা করেন তাঁদের কথা আলাদা, কিন্তু সতিই যাঁরা শিল্পোদ্যোগী, তাঁরা ঐসব বিজ্ঞাপনাদি দেখে কখন কোন সিদ্ধান্ত নিলে ভুল হবে। বিজ্ঞাপনে সব কিছু বলা বা বোঝানো কখনই সম্ভব নয়। সে জন্য বিজ্ঞাপন-দাতার কাছ থেকে বিষয়টির সব দিক জেনে তবে যে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ভাল।

শিল্প গড়ার কাজে কেন এলেন সেটা নিজে বিচার করবার জন্যে কি ভাবে ভাবতে হবে তার বিষয়ে কিছু আলোচিত হল। প্রত্যেকটি শিল্পোদ্যোগীর জন্যে ভাবনা আলাদা হবে নানা পারিপার্শ্বিক কারণে। তাই কিছু সাধারণ বিষয় আলোচনা করা ছাড়া উপায় নেই। তবে এভাবে শুরু করলে প্রত্যেকেই নিজের নিজের শিল্প গড়তে আসার কারণটা বুঝতে পারবেন।

সব রকমের প্রচেষ্টায় বিফল হয়ে শেষপর্যন্ত শিল্প গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করে সফলকাম হয়েছেন এমন শিল্পোদ্যোগীও যে নেই তা বলা যায় না। অবশ্য সেখানে শিল্প গড়ার কাজে আসার কারণটা সেই শিল্পোদ্যোগীর কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল।

নিজস্ব আর্থিক সংগতি :

কেন শিল্প গড়ার কাজে নামলেন সেটা ঠিকমত ভাবা হলে কেবল প্রথম কাজটি হল। শুধু এটা হলেই চলবে না। এরপর তাকাতে হবে আর্থিক সংগতির দিকে। শিল্প স্থাপনের কাজে হাত দিলে প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত যার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি তা হল অর্থ। অতএব কি তৈরি করবেন, কোথায় করবেন ইত্যাদি ভাববার আগেই ভাবতে হবে অর্থের কথা– আপনার আর্থিক সংগতির কথা। এই আর্থিক সংগতি বলতে বলতে চাইছি, আপনি নিজে মোট কত টাকা শিল্পে বিনিয়োগ করতে পারবেন। আপনার নিজস্ব আর্থিক সংগতির ওপর নির্ভর করছে আপনি কতবড় শিল্পস্থাপনে সমর্থ, নির্ভর করছে কি ধরনের শিল্প-স্থাপনে সমর্থ বা কি কি মাল আপনি উৎপাদন করতে পারবেন ইত্যাদি। সুতরাং শুরুতেই নিজস্ব আর্থিক সংগতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। তবে ধরুন যদি আপনার আর্থিক সংগতি না থাকে তাহলে কি হবে? তাহলে প্রথমেই দেখতে হবে স্ব-নিয়োগ পরিকল্পনার শর্ত অনুসারে আপনি ঐ পরিকল্পনার অন্তর্গত ঋণ পাবার যোগ্য কিনা। যদি তা না হয় তাহলে আপনার পক্ষে একটা শিল্পস্থাপন করা সম্ভব নয়। আপনাকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সংগতিসম্পন্ন আর একজন সমমনোভাবাপন্ন সংগী যোগাড় করতে হবে। শিল্পে বিনিয়োগ বাবদ ঋণ হিসাবে অর্থ দেবার জন্যে অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কিন্তু ঋণের অনুপাতে আপনাকে যেটা নিজের তহবিল থেকে দিতে হবে সেটা আগের থেকেই হাতে থাকা চাই। একমাত্র স্ব-নিয়োগ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে শিল্পোদ্যোগীকে কোন অর্থ বিনিয়োগ করতে হয় না।

আর্থিক সংগতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না থাকলে পদে পদে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ পরবর্তী সমস্ত পদক্ষেপই এর ওপর নির্ভরশীল। একথা আর একবার বলার কারণ এ সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত করা। তাছাড়া এর পরবর্তী কাজ হল 'স্কীম' বা পরিকল্পনা তৈরির কাজে হাত দেওয়া। সে কাজ করতে গেলে প্রথমেই আর্থিক সংগতির প্রশ্ন ওঠে।

'স্কীম' বা পরিকল্পনার ধারণা :

'স্কীম' বা পরিকল্পনা তৈরিতে অন্যের সাহায্য নিতে পারেন। এই বিষয়ে সহায়তা করার জন্য বেশ কয়েকটি সংস্থা রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প দপ্তর অনুমোদিত সংস্থাও রয়েছে। কিন্তু আগেই যেমন বলেছি এখানেও বলছি নিজেরই আগের থেকে কিছু ধারণা না থাকলে পদে পদে অসুবিধারও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

'স্কীম' করবার আগেই আর্থিক সংগতি সম্পর্কে দেখে নিয়েছেন। তার সংগে সংগতি রেখেই ঠিক করতে হবে কি উৎপাদন করবেন, কি মাপের হবে আপনার শিল্প প্রতিষ্ঠান। যদি কোন সংস্থাকে দিয়ে 'স্কীম' তৈরি করাতে চান তাহলেও প্রথমেই কয়েকটি তথ্য আপনাকে সরবরাহ করতে হবে। তাতে আর্থিক সংগতি ছাড়া আরো অন্যান্য বিষয় থাকবে। অতএব 'স্কীম' সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক ধারণা নিয়েই এগোনো ভাল।

এবার দেখা যাক, 'স্কীম' কিভাবে হয়। একটি শিল্প গড়তে গেলে কি ভাবে সেই প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন হবে সেখান থেকে শুরু করে কারখানা বা শিল্পপ্রতিষ্ঠানে মাল উৎপাদন ও বিক্রী করে লাভজনক ভাবে চালু থাকা পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের নিখুঁত পরিকল্পনাকে 'স্কীম' আখ্যা দেওয়া হয়। কর্মকান্ড যত বড় হয় 'স্কীম' এর আকারও তেমন বড় হতে থাকে। কিন্তু প্রতিপাদ্য বিষয় ঠিকই থাকে। মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলো কি ?

কি উৎপাদন করা হবে ঠিক হলে প্রথমে দেখতে হবে সেজন্যে এককালীন খরচের হিসাবটি। এই এককালীন খরচের মধ্যে কি কি আছে ? কারখানার জমি, বাড়ি, কারখানার জন্যে 'শেড' প্রভৃতি বাবদ খরচ, মাল উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় যাবতীয় যন্ত্রপাতি কেনা ও কারখানায় বসানো পর্যন্ত সমস্ত খরচ। জল, বিদ্যুৎ প্রভৃতির সংযোগ ও কারখানার সর্বত্র পৌছে দেবার জন্য করণীয় সমস্ত খরচ। এছাড়াও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কিছু কিছু অন্যান্য খরচ এই খরচের হিসাবের মধ্যে স্থান পায়। এখানে জেনে রাখা ভাল যে বাড়ি, জমি বা শেড যদি মাসিক ভাড়ায় নেওয়া হয়, তাহলেও তার একটি নির্দিষ্ট গুণিতককে এই হিসাবে ধরা হয়।

এরপর আসছে নিয়মিত খরচের হিসাবের তালিকা। তাতে কি কি আছে ? তাতে রয়েছে মাসিক বা বার্ষিক মোট প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যন্ত্রাংশ, অল্পদিন ব্যবহারে নষ্ট হয় এমন ছোটখাট যন্ত্রপাতি প্রভৃতির খরচ, বিদ্যুতের খরচ, ঋণ পরিশোধ বা সুদ বাবদ খরচ প্রভৃতি। এছাড়া রয়েছে কর্মচারী খাতে খরচ, বিজ্ঞাপন খাতে খরচ প্রভৃতি নানান দৈনন্দিন খরচ। বাড়িভাড়া বীমা, পরিবহণ প্রভৃতি বাবদ খরচও এই তালিকায় রয়েছে।

তাহলে কি দাঁড়াল ? এককালীন খরচ আর নিয়মিত খরচ–এই দুই রকমের খরচ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে হবে। এককালীন খরচের মধ্যে বাড়ি, জমি, শেড প্রভৃতির খরচ এবং বিদ্যুৎ সংযোগ, জলের ব্যবস্থা ও তার নিষ্কাশন বাবদ খরচ জায়গা অনুযায়ী আলাদা হবে। কিন্তু যেসব যন্ত্রপাতি প্রয়োজন ও যেসব যন্ত্রাংশ প্রয়োজন তার দাম একই হবার কথা। এ বিষয়ের খবরাখবর আপনি নিজেও নিতে পারেন এবং মনে হয় নেওয়া উচিতও। সমস্ত খরচের ব্যাপারে নিজে খবর নেওয়া সর্বদাই লাভজনক। জমি, বাড়ি, শেডের ব্যাপারেও নিজে যোগাযোগ করলে ভাল হয়। এসব ক্ষেত্রে সব রকমের মাধ্যমকে যথাসম্ভব অল্প ব্যবহার করা উচিত।

জল বিদ্যুতের বিষয়েও ঐ একই কথা। এখানে একথা বলার কারণ 'স্কীম' তৈরি করা অথবা 'মডেল স্কীম'গুলো থেকে একটা বেছে নেওয়ার সময় থেকে বা তার আগে থেকে এই বিষয়ে ভেবে রাখা দরকার।

এককালীন খরচের পর আসছে নিয়মিত খরচের বিষয়টি। এখানে বাড়িভাড়া বা জমি বা শেড ভাড়া, বীমা, দেনা শোধ, ঋণের সুদ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি কয়েকটি খরচ বাঁধা খরচের মত। অবশ্য উৎপাদনে বিদ্যুতের ব্যবহার থাকলে সেটা উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল। কাঁচামাল, কারিগর, সাধারণ শ্রমিক, অন্যান্য কর্মচারী, যন্ত্রাংশ কেনা প্রভৃতির খরচ কাজ অনুসারে বদলায়। কারণ ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজের কম বেশিতে সবই বদলায় বা বদলাতে হয়।

'স্কীম' করার সময় এসব খরচ অবশ্য নিয়মিত হিসাবে ধরতে হয় কারণ একটা নির্দিষ্ট উৎপাদনের ভিত্তিতে 'স্কীম' তৈরি হয়। তার ওপরেই লাভ লোকসানের হিসেব করা হয়। 'স্কীম' লাভজনক না হলে সে কাজে নামার কোন অর্থ হয় না। তবে 'স্কীম' করার আগে থেকেই জানা দরকার 'স্কীম' সব কিছু নয়। তার প্রয়োজন কাজ শুরু হবার আগে পর্যন্ত। কারখানায়-কাজ একবার শুরু হলে কাজের তাগিদে অনেক কিছু বদলান প্রয়োজন হয়। সে সময়ে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন না করলে অসুবিধায় সৃষ্টি হয়।

নিয়মিত খরচের বিষয়েও আগে থেকেই জানার চেষ্টা চালান ভাল। তাহলে আসল কাজে যখন নামবেন তখন নিজেকে অনেক হাল্কা লাগবে।

খরচের বিষয় জানবার পর জানতে হবে আয়ের হিসাব। আয় না করলে ব্যয় বা খরচ হবে কি করে? অতএব আয় কত এবং তাতে খরচ কুলিয়ে লাভ কত থাকে সেটা দেখা ও দেখানো 'স্কীমে'র একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

আয় হবে কোথা থেকে? আয় হবে উৎপাদিত মাল বিক্রী হলে এবং সেখান থেকে টাকাটা পাওয়া গেলে। অনেক ক্ষেত্রেই নগদে মাল বিক্রী হয় না। সেজন্য টাকাটা না পাওয়া পর্যন্ত আয় হচ্ছে না। কোথাও কোথাও মাল সরবরাহ করার আগে বা পরে মাল পরীক্ষা করে দেখে তবে তার দাম দেওয়া হয়। মান অনুযায়ী মাল তৈরি না হলে সে মাল ফিরিয়ে আনতে হয়। সেজনেই বলছি কোন কোম্পানী মাল নেবে বলা মানেই বিক্রীর 'গ্যারান্টি' নয়। যদিও অনেক নবীন শিল্পোদ্যোগী এই ভুল ধারণাটা করে বসেন। যা হোক 'স্কীমে'র এই ভাগে দেখতে হবে 'স্কীম' অনুযায়ী কত বিক্রীর উপযুক্ত মাল তৈরি হবে। সে মাল কোথায় বিক্রী হবে। সাধারণ বাজারে? তা হলে দেখতে হবে সেখানে প্রয়োজন থেকে সরবরাহ কম আছে কি? বাজারে যে দামে মালটি বিক্রী হচ্ছে সেই দাম বা তার থেকে সামান্য কম দামে বিক্রী করলে লাভজনক হবে কি? মালের মান বাজারের অন্য মালের থেকে উন্নত না কি একটু নিম্নমানের। এসব বিচার করে তবে আপনাকে সাধারণ বাজারে মাল বেচাকেনায় নামতে হবে।

এবার ধরুন আপনি যে মাল তৈরি করেন তা সরাসরি বড় বড় কোন প্রতিষ্ঠান কিনে থাকেন। চাহিদাও যথেষ্ট রয়েছে। তখন আপনাকে দেখতে হবে বড় বড় প্রতিষ্ঠান বর্তমানে যে মাল কিনছেন তার চেয়ে আপনার উৎপাদিত মালের মান উন্নত কিনা। অর্থাৎ অন্যের থেকে আপনারটি ভাল হলে ক্রেতা সহজেই আপনার দিকে ঝুঁকবেন।

এমনি নানান দিক বিচার করে ঠিক করতে হবে 'স্কীম' অনুযায়ী উৎপাদিত মাল সব বিক্রী হবে কিনা, হলে কতদিনে হবে, কতদিনে টাকা পাওয়া যাবে এবং সেই টাকা আবার শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কাজে লাগান যাবে।

'বাজার সমীক্ষা' বলে একটা কথা হয়ত শুনেছেন। এতক্ষণ যা মাল বিক্রীর ব্যাপারে বলেছি তা ছাড়া আরো অনেক দিক বিচার করে, উৎপাদিত মাল বাজার জাত করার সম্ভাবনা খুঁটিয়ে দেখাকেই 'বাজার সমীক্ষা' বলা যায়। কোন উৎপাদন শুরুর আগে এই সমীক্ষা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ বিক্রীর একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা না হলে মাল উৎপাদন করার কোনো অর্থ হয় না। কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্য তো শুধু মাল উৎপাদনই নয় সে মাল বিক্রী করাও। 'স্কীমে'র সার্থকতা নির্ভর করে উৎপাদিত মাল বিক্রয়ের সাফল্যের ওপর।

এ যাবৎ যা বললাম তা হল 'স্কীম' বা পরিকল্পনার যে ধারণা দেব বলেছি তার একটা দিক। এর পরেও আছে। তবে সেগুলো কোথাও বিশেষভাবে প্রযোজ্য, আবার কোথাও প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ শিল্পোদ্যোগীর গুণাগুণ, শিক্ষা বা অন্যান্য যোগ্যতা অনুযায়ী কারো কারো পক্ষে প্রযোজ্য। আর এতক্ষণ যা যা বলেছি তা প্রায় সবার পক্ষেই প্রযোজ্য। সেইসব বিষয়ে আগামী সংখ্যায় আলোচনার চেষ্টা করব।

(৩৯৯ পৃষ্ঠার পর)

ঊনবিংশ শতকের পাঁচালী গান

মাঝে কথা অর্থাৎ ছোটখাট বক্তৃতা। দাশরথি কবিগান ও মঙ্গল গান মিশিয়ে পাঁচালীর সৃষ্টি করেন। দাশুর ছড়া প্রায় ত্রিপদীতেই রচিত, মাঝে মাঝে পয়ারও আছে।

ডঃ সুকুমার সেন পুতুল নাথ প্রথার সংগে পাঁচালী গানের একটা সম্বন্ধ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রচলিত পুতুল নাচের যোগাযোগ চোখে পড়ে না। তবে এমন হতে পারে যে পুতুলনাচের প্রথা ক্রমে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বা রামায়ণ ও মংগল কাব্যাদির পাঁচালী চন্ডীমন্ডপে বা দেবমন্দিরে গীত হত বলে পুতুল নাচের কোন দরকার হতো না। অথবা ক্রমে পুতুল ছেড়ে পাঁচালীর গায়ক নিজেই আসরে নেমে নাচতে আরম্ভ করেন এবং পঞ্চালিকা বা পুতুল বিদায় নিলেও পাঁচালী নামটি বিদায় নিল না। গানের আসরে এখনও দেখা যায় ঘট, পট, আসন ইত্যাদি এবং ঘটে পুত্তলিকাও অঙ্কিত হয়। তবে কি এই পুত্তলিকাই পুতুলের স্মারক?

পদ ও পাঁচালীকে যেমন এক বলা যায় না তেমনি মংগলকাব্যের সংগেও পাঁচালীর সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। বিশেষভাবে দেবমহিমাজ্ঞাপক কাব্যগুলিকেই মংগলকাব্য বলা হয়। শ্রীচৈতন্যের মতে দেবোপম চরিত্রমূলক কাব্যও মংগলকাব্য। পাঁচালীর বিষয়বস্তু অধিকাংশই দেবমহিমাজ্ঞাপক হলেও দেবমহিমা নিরপেক্ষ পদ্মাবতী, লোরচন্দ্রাণী, বিদ্যাসুন্দর কাব্যসমূহকে পাঁচালীর অংগ থেকে বাদ দেওয়া যায় না। এ হিসেবে পাঁচালীর পরিমন্ডল মংগলকাব্যের গন্ডিকে ছাড়িয়ে গেছে। দ্বিতীয়তঃ বিষয়বস্তুর কথা বাদ দিলেও নতুন পদ্ধতির পাঁচালী প্রয়োগ পদ্ধতি ও গাইবার রীতির সংগে মংগলকাব্যের একটি বিশেষ পার্থক্য এই যে মংগলকাব্যে ছড়া নেই, আছে শুধুমাত্র গান, পয়ার আবৃত্তি এবং ছোটখাট বক্তৃতা। অপর পক্ষে নতুন পদ্ধতির পাঁচালীর অন্যতম আকর্ষণ ছড়া। এখনও গ্রামবাসীরা দাশুরায়ের পাঁচালী বলতে এই ছড়াগুলিকেই বোঝে। দাশরথির পূর্বে নতুন পদ্ধতির পাঁচালী পাওয়া যায় না। সেজন্য ছড়া যে কবে থেকে পাঁচালীর মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল সে কথা সঠিক ভাবে বলা যায় না। তবে অনুমান করা যেতে পারে দাশরথি কবির দলের সরকারী ছেড়ে যখন পাঁচালী রচনায় হাত দিলেন তখন কবিগানের জনপ্রিয় অংশগুলি তিনি পাঁচালীতে যুক্ত করেছিলেন। দাশরথি রায়ই পাঁচালীকে একেবারে নতুন করে ঢেলে সাজিয়েছিলেন।

কবিগানের জনপ্রিয়তা যখন ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে লাগল তখন পাঁচালী সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ছোটবেলায় দাশরথি রায়ের গান শুনে মুগ্ধ হয়ে যেতেন। তিনি এ সম্পর্কে লিখেছেন—"রামায়ণ আবৃত্তি করা হচ্ছে, এমন সময় আমাদের পিতার অনুচর কিশোরী চাটুজ্যে আসিয়া দাশুরায়ের পাঁচালি গাহিয়া বাকি অংশটুকু পূরণ করিয়া গেল,—কৃত্তিবাসের সরল পয়ারের মৃদুমন্দ ঝকমকি ও ঝংকারে আমরা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম।"

ঊনবিংশ শতাব্দীর নতুন পাঁচালীর মধ্যে তৎকালীন সামাজিক সমস্যাকে নিয়ে পালা রচিত হতে দেখা যায়। এটি শুধুমাত্র ঊনবিংশ শতাব্দীরই নয়, সমাজের সমসাময়িক এবং লৌকিক বিষয়বস্তুকে নিয়ে পাঁচালী রচনার রীতি চিরকালই প্রচলিত ছিল। অত্যন্ত আধুনিক বিষয়বস্তু নিয়ে আজও লোক কবিরা লোক সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষার কথাকে পাঁচালীতে রূপান্তরিত করে চলেছেন।

আসলে ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিগান, পাঁচালী, তরজা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে যে লৌকিক ঐতিহ্যের অনুসরণ তার পশ্চাৎ-এ লোক সাহিত্যের সুগভীর প্রভাব বর্তমান। বাংলা লোকগীতির যে সুপ্রাচীন ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল মধ্যযুগে ঊনবিংশ শতাব্দীর পাঁচালী, তরজা, টপ্পা, ইত্যাদির মধ্যে তারই অনুসরণ হয়েছে মাত্র। লোকগীতির বহুধারার মধ্যেই আছে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও বিবিধ পুরাণাদির অনুসরণ যা ঊনবিংশ শতাব্দীর পাঁচালীর মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়।

১। সেন সুকুমার/বাংগালা সাহিত্যের ইতিহাস। পৃঃ ৮৪

২। S. K./ History of Bengali literature in the 19th Cen...

মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান

বর্তমান বছরে উপর্যুপরি বিধ্বংসী বন্যায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এক ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বহু জীবন ও সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। রাজ্য সরকার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের ত্রাণের জন্য বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তবু জনগণের সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া এর সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব নয়। মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়ে ইতিমধ্যে রাজ্যের ও রাজ্যের বাইরে বহু ব্যক্তি মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে মুক্ত হস্তে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন। এই স্তম্ভে আমরা তাঁদের নাম, সংক্ষিপ্ত ঠিকানা ও প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ ক্রমশ প্রকাশ করছি। —সম্পাদক

	নাম ও সংক্ষিপ্ত ঠিকানা	টাকার পরিমাণ
	৮ নভেম্বর তারিখে প্রাপ্ত তালিকা	
১।	ভাটপাড়া পৌরসভার কমিশনারবৃন্দ	টাঃ ৫০১.০০
২।	ভাটপাড়া পৌরসভার কর্মচারীবৃন্দ	২,৭৭০.০০
৩।	ভাটপাড়া-নৈহাটী কোঃ অঃ ব্যাঙ্ক	২,০০১.০০
৪।	জগত্তারিণী ট্রাষ্ট, ভাটপাড়া	৫০১.০০
৫।	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি(মাঃ) ভাটপাড়া শাখা	১,৮৪৬.০০
৬।	ভাটপাড়া-নৈহাটী কোঃ অঃ ব্যাঙ্কের কর্মচারীবৃন্দ	১৫১.০০
৭।	ঐক্যতান পাবলিশার্স ও বুক সেলার্স	৫১.০০
৮।	ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যাল মার্চেন্ট এ্যাসোসিয়েশান	৫০১.০০
৯।	মেসার্স অভয় পদ কোঙার, কাঁকিনাড়া	২৫২.০০
১০।	সুজাতা মোদক	৩৬.০০
১১।	রবীন্দ্রনাথ সাধুখাঁ	১০১.০০
১২।	জোয়ানা সংঘ, জগদ্দল, বি.এল. নং ৯	২০১.০০
১৩।	১নং দুর্গাপূজা কমিটি, আতপুর ওয়ার্ড নং ১৯	৫১.০০
১৪।	২নং দুর্গাপূজা কমিটি, আতপুর ওয়ার্ড নং ১৯	১০১.০০
১৫।	৩নং দুর্গাপূজা কমিটি, আতপুর ওয়ার্ড নং ১৯	৩১.০০
১৬।	বি.পি. স্পোর্টিং ক্লাব, আতপুর ওয়ার্ড নং ১৯	১০১.০০
১৭।	শাস্ত্রী সংঘ, আতপুর	১০১.০০
১৮।	আতপুর বাজার কমিটি	১০১.০০
১৯।	১৯ নং ওয়ার্ড কমিটি	২০১.০০
২০।	ইয়ং স্টার, আতপুর	৫১.০০
২১।	মিলন সংঘ, আতপুর	৫১.০০
২২।	স্টুডেন্টস হেলথ অরগানাইজেসার্স, গোলঘর	১০১.০০
২৩।	সাহিত্য মন্দির, ভাটপাড়া	১০১.০০
২৪।	টাইনি টট স্কুল, ভাটপাড়া	১০১.০০
২৫।	ভারতীয় নও যুবক সংঘ ৪নং গেট	১৫১.০০
২৬।	পুরাণী বাজার দুর্গাপূজা কমিটি	১৫১.০০
২৭।	কাকলি ঘোষ	১০১.০০
২৮।	শরৎ পল্লী পূজা কমিটি ১০ নং ওয়ার্ড	৫১.০০
২৯।	কিশোর বাহিনী ১০নং ওয়ার্ড	১০১.০০
৩০।	সুয়োরমারী পূজা কমিটি	১৫১.০০
৩১।	নতুনগ্রাম রোড পল্লীশ্রী দুর্গাপূজা কমিটি	৫১.০০
৩২।	পদ্মপুকুর ফ্রেন্ডস স্টাফ	১০১.০০
৩৩।	পঃবঃ রেলওয়ে হকার্স ইউনিয়ন, শ্যামনগর শাখা	১০১.০০
৩৪।	সার্বজনীন দুর্গোৎসব পরিষদ, স্টেশন রোড, শ্যামনগর	৫১.০০
৩৫।	গোলঘর যুবকবৃন্দ জগদ্ধাত্রী পূজা কমিটি	৫০১.০০
৩৬।	পদ্মপুকুর যুবক বৃন্দ	৫১.০০
৩৭।	পূর্ব ভাটপাড়া জনকল্যাণ কেন্দ্র	২০১.০০
৩৮।	ইরা কুন্ডু	২১.০০
৩৯।	আতপুর বাজার রেশন সপ্	২০৫.০০

	নাম ও সংক্ষিপ্ত ঠিকানা	টাকার পরিমাণ
৪০।	ভাটপাড়া এ.আর. ওনার্স এ্যাসোসিয়েশন	৫,০০১.০০
৪১।	মুখার্জীপাড়া দুর্গাপূজা কমিটি	৫১.০০
৪২।	রাজশ্রী ভট্টাচার্য	৫১.০০
৪৩।	যুগের প্রতীক, শ্যামনগর	১০১.০০
৪৪।	ভাটপাড়া নারী শিক্ষা মন্দির	৬১.০০
৪৫।	বিশ্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, চালকীপাড়া	৩০১.০০
৪৬।	নেতাজী নগর কলোনী পূজা কমিটি ২৬ নং রেল গেট	৫১.০০
৪৭।	ব্যানার্জীপাড়া দুর্গোৎসব কমিটি, শ্যামনগর	২০১.০০
৪৮।	আতপুর বারোয়ারী নিয়োগীপাড়া	১৫১.০০
৪৯।	ভাটপাড়া হাইস্কুল	২৫১.০০
৫০।	মূলাজোড় জেনারেটিং বিশ্বকর্মা পূজা কমিটি	৩০১.০০
৫১।	বড়বাগান সার্বজনীন পূজা কমিটি	২০১.০০
৫২।	মূলাজোড় কল্যাণ সংঘ, শ্যামনগর	১০১.০০
৫৩।	দঃ পূঃ রবীন্দ্রপল্লী পূজা কমিটি	৩১.০০
৫৪।	শ্যামনগর বাজার ব্যবসায়ী সমিতি	২০১.০০
৫৫।	ভাটপাড়া বালক সমিতি	১০১.০০
৫৬।	ভাটপাড়া যুগের প্রতীক	৫১.০০
৫৭।	শ্যামনগর বিনয় স্মৃতি সবুজ সংঘ	৫০.০০
৫৮।	আতপুর অগ্রদূত সংঘ	১০১.০০
৫৯।	নাগবাগান সার্বজনীন পূজা কমিটি	১০১.০০
৬০।	মিলন সংঘ শ্যামনগর রবীন্দ্রপল্লী	৫১.০০
৬১।	উদয়ন সংঘ, আতপুর	৫০১.০০
৬২।	জাগৃতি, আতপুর	৩৫১.০০
৬৩।	আতপুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সেবক সংঘ	৫১.০০
৬৪।	আতপুর মিলন পূজা কমিটি	১০১.০০
৬৫।	আতপুর সম্মিলনী	১০১.০০
৬৬।	নিরুপম সাহা, এ.আর. ৮৬	৫১.০০
৬৭।	বীণাপানি ঘোষ, এ.আর. ৮৩	৫১.০০
৬৮।	শ্যামনগর রিক্সা চালক সমিতি	১০১.০০
৬৯।	রবীন্দ্রপল্লী সার্বজনীন দুর্গাপূজো কমিটি, পূঃ ভাটপাড়া	৫১.০০
৭০।	সুকান্ত স্পোর্টিং ক্লাব, রবীন্দ্রনগর	১০১.০০
৭১।	তরুণ দল সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, শ্যামনগর	১০১.০০
৭৩।	শ্যামা সংঘ, কাঁটাডাঙ্গা	৫১.০০
৭৪।	সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি	১০১.০০
৭৫।	আতপুর নূতন পল্লী দুর্গোৎসব কমিটি, শ্যামনগর	১০১.০০
৭৬।	নিরঞ্জন সেন পল্লী পূজা কমিটি	২০১.০০

৭৭।	ছাত্র সংগঠন ক্লাব পূজা কমিটি	১৫১.০০
৭৮।	মিলন সংঘ, শ্যামনগর	১০১.০০
৭৯।	বটতলা পূজা কমিটি, শ্যামনগর	১০১.০০
৮০।	রামকৃষ্ণ পল্লী ঐকতান ক্লাব পূজা কমিটি	১৫১.০০
৮১।	বিশ্বকর্মা পূজা কমিটি নিক্‌কো স্টিল	৫০১.০০
৮২।	শ্যামনগর তরুণ সংঘ	১০১.০০
৮৩।	রথতলা তরুণ সংঘ	৫০১.০০
৮৪।	অগ্রগামী কালী পূজা কমিটি, আতপুর	৫১.০০
৮৫।	নিক্‌কো স্টীল কন্‌ট্রাক্টারস ইউনিয়ন	৩০১.০০
৮৬।	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি(মাঃ) ক্লোরাইড ব্যাটারী ব্রাঞ্চ ১,২,৩	৮৩১.০০
৮৭।	নিউ কর্ড রোড যুবকবৃন্দ কালী পূজা কমিটি (ব্যাটারী গেট)	২০১.০০
৮৮।	আতপুর সুন্দিয়া দুর্গোৎসব কমিটি (ব্যাটারী গেট)	১০১.০০
৮৯।	প্রধান শিক্ষিকা, তারকনাথ বিদ্যালয়	৫১.০০
৯০।	এন.আর.এস.আর. কন্‌ট্রাকটারস ওয়ার্কস ইউনিয়ন	২০১.০০
৯১।	আতপুর পঞ্চাননতলা দুর্গাপূজা সমিতি	৫১.০০
৯২।	নিও পাইপস এ্যান্ড টিউবস বিশ্বকর্মা পূজা কমিটি	৫০১.০০
৯৩।	কালীতলা পাঁটাডাঙা সার্বজনীন শ্যামাপূজা কমিটি	৫১.০০
৯৪।	পঃ ব্যানার্জীপাড়া ও আর. এন. টি. পি. রোড সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি	১০১.০০
৯৫।	শান্তি সেবা কমিটি, পঞ্চাননতলা, আতপুর	৫১.০০
৯৬।	কাঁচামাল ব্যবসায়ী সমিতি, আতপুর	১৫১.০০
৯৭।	আতপুর আমতলা দুর্গাপূজা কমিটি	১০১.০০
৯৮।	বাবুপাড়া পূজা কমিটি	৫১.০০
৯৯।	সত্য স্মৃতি সংঘ, কাঁটাড়াঙগা	৫১.০০
১০০।	ভারতের গণতান্ত্রিক যুব কেন্দ্র শ্যামনগর আঃ কমিটি	৫১.০০
১০১।	কুহু সাহিত্য সংস্থা, কাঁটাভাঙা	৫১.০০
১০২।	রমাকান্ত ঘোষ নন্দলাল মিষ্টান্ন বিক্রেতা	৫১.০০
১০৩।	শতদল সংঘ, কাঁটাডাঙগা	৫১.০০
১০৪।	মালাপাড়া দুর্গাপূজা কমিটি	৫১.০০
১০৫।	আতপুর নবীন সংঘ টাঃ	৫১.০০
১০৬।	উদয়ন সংঘ, শ্যামনগর (২২ নং)	৬০৫.০০
১০৭।	গাছ বাঁচাও কমিটি কাঁটাডাঙা	৫১.০০
১০৮।	সম্মিলনী ক্লাব, কাঁটাডাঙা	১০১.০০
১০৯।	আপনজন নিমতলা ঘাট রোড শ্যামনগর জগদ্ধাত্রী পূজা কমিটি	২৩৭.১৭
১১০।	অঞ্জন হালদার, ভাটপাড়া	৫১.০০
১১১।	আতপুর ভ্রাতৃ সংঘ	২০১.০০
১১২।	মিলন সংঘ মুক্তারপুর ভাটপাড়া	১০১.০০
১১৩।	রামচন্দ্র সিং শিব মন্দির কালীপূজা, শ্যামনগর	৫১.০০
১১৪।	নবজ্যোতি কালীপূজা কমিটি	৩১.০০
১১৫।	প্রগতি পাঠাগার সুন্দিয়া গভঃ কোঃ	২০১.০০
১১৬।	সুন্দিয়া প্রগতি সংঘ	৫১.০০
১১৭।	নবারুণ সংঘ আতপুর কালীপূজা কমিটি	৫১.০০
১১৮।	আতপুর প্রতাপ নগর কালীপূজা কমিটি	৫১.০০
১১৯।	ডি.ওয়াই.এফ.আই কাঁকিনাড়া শাখা	৮০১.০০
১২০।	বাজারপাড়া দুর্গোৎসব কমিটি, ভাটপাড়া	৫১.০০
১২১।	সুন্দিয়া এলাকা যুবক বৃন্দ	৫৫১.০০
১২২।	উদয় সংঘ, ভাটপাড়া	২০১.০০
১২৩।	বিবেকানন্দ বাজার কমিটি	১০১.০০
১২৪।	ফেরী ঘাট কালী পূজা কমিটি	৩১.০০
১২৫।	শ্যামা দেবী, স্বামী এন প্রসাদ	৫৫১.০০
১২৬।	গোপাল হালদার, শ্যামনগর	৩১.০০
১২৭।	দেশপ্রিয় ক্লাব, দেশবন্ধুনগর	৫১.০০
১২৮।	শরৎ পল্লী সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি	৫১.০০
১২৯।	দাসবাগান সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি	১০১.০০
১৩০।	লোয়ার বাগনান দুর্গোৎসব কমিটি	৫১.০০
১৩১।	শ্যামনগর ভারত চন্দ্র রায়পথ দুর্গাপূজা কমিটি	২০১.০০
১৩২।	মন্ডলপাড়া সার্বজনীন দুর্গোৎস কমিটি	৫১.০০
১৩৩।	বাসুদেবপুর রোড সার্বজনীন দুর্গোৎসব পূজা কমিটি	৩০১.০০
১৩৪।	শ্যামনগর সবুজ সংঘ দুর্গোৎসব পূজা কমিটি	১০১.০০
১৩৫।	নাগবাগান শ্যামা পূজা কমিটি	৬১.০০
১৩৬।	শম্ভু স্মৃতি সংঘ শ্যামনগর	৫১.০০
১৩৭।	নাগবাগান বিদ্রোহী সংঘ	৫১.০০
১৩৮।	ভাটপাড়া কিশোর সংঘ	১০১.০০
১৩৯।	নেহেরু মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতি কালি পূজা কমিটি	১০১.০০
১৪০।	কাঁটাডাঙা সমাজ কল্যাণ সংঘ	৫১.০০
১৪১।	দূর্গা ফার্মেসী	১০১.০০
১৪২।	বি. ওয়াই. এম. এ	১০১.০০
১৪৩।	চৈতালী সংঘ রাহা পাড়া, ভাটপাড়া	৫১.০০
১৪৪।	প্রগতি সংস্কৃতি সংঘ	১০১.০০
১৪৫।	শ্যামনগর বড়কালী পূজা কমিটি	৫১.০০
১৪৬।	ভাটপাড়া সেন্ট্রাল স্কুল	১০১.০০
১৪৭।	ভাটপাড়া যুবক তরুণ সংঘ	৫১.০০
১৪৮।	সার্বজনীন শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা, আতপুর	৫১.০০
১৪৯।	ব্যানার্জিপাড়া বয়েজ ক্লাব, শ্যামনগর	৫১.০০
১৫০।	সূর্য সংঘ আতপুর	৫১.০০
১৫১।	শ্রী অনিল সাহা	৫০১.০০

১৪ নভেম্বর তারিখে প্রাপ্ত তালিকা

১।	ডঃঅনিলকুমার বিশ্বাস, ভাগলপুর, বিহার	৭০০.০০
২।	টি এন্ড সি পি অফিসার্স এ্যাসোসিয়েশন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলিকাতা,	৫০১.০০
৩।	পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক আইনজীবী সমিতি, কলিকাতা	২,৫০০.০০
৪।	ই.বি. প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, সল্টলেক	২০০.০০
৫।	এস এস শূর, কলিকাতা-৩	১০০.০০
৬।	জনকল্যাণ সমিতি, নিউ ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা	২০১.০০
৭।	সি.এন পেন অ্যান্টনি	৫০১.০০
৮।	জি সরকার, বাগুইহাটি কলিকাতা	৫০১.০০
৯।	পরেশ মুখার্জি, রায় নগর (সাউথ)	১০০.০০
১০।	ডবলু বি.এস.এস.পি.এম.এ. কলিকাতা	৫,০০১.০০
১১।	প্রান্তিক ক্লাব, বার্ণপুর, বর্ধমান	১,০০১.০০
১২।	বরানগর বিদ্যামন্দির (বালিকাদের জন্য)	২৫০.০০

□(পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জিয়াগঞ্জে জাতীয় সংহতি বিষয়ক আলোচনাচক্র

৩১ অক্টোবর ১৯৮৭ তারিখে মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, লালবাগ-এর উদ্যোগে এবং স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় জিয়াগঞ্জ বীরেন্দ্র সিংঘী স্কুল ময়দানে ভারতের জাতীয় সংহতি বিষয়ক একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীসুনীত দে, প্রাক্তন পৌরপিতা, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ পৌরসভা ও প্রধান অতিথি ছিলেন মুজফ্ফর হোসেন, সভাপতি, নবগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতি। অনুষ্ঠানের শুরুতে দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করেন স্বপন সাহা। প্রারম্ভিক ভাষণে মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক, বলেন জাতীয় সংহতি ভারতবাসীর ক্ষেত্রে একটা প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন প্রদেশগুলির মধ্যে বিরোধ আমাদের মিটিয়ে ফেলতে হবে এবং আজ আমরা সবাই মিলে বিরোধ ভুলে ভারতকে এক জাতি এক প্রাণ হিসাবে গড়ে তুলব এটাই আমার একমাত্র আশা।

প্রধান অতিথি মুজফ্ফর হোসেন বলেন, আজকে ভাবার সময় এসেছে, পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে চলছে তীব্র সংকট ও বেকারী। বিদেশী শক্তিগুলি অনুন্নত দেশগুলিতে ধর্মীয় বিভিন্ন কাজকর্মের মাধ্যমে মিশন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির মাধ্যমে জাতীয় সংহতি বিপন্ন করতে চাইছে। এরা মিশনের মাধ্যমে অনুন্নত দেশগুলিতে অশিক্ষিত নিরক্ষর মানুষদের মধ্যে দারিদ্র্যের সুযোগে কিছু পাইয়ে দিয়ে নিজেদের ধর্মে ধর্মান্তরিত করে নিয়েছে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রসার ঘটাচ্ছে। এগুলি আমাদের চিন্তা করতে হবে। আমাদের বুদ্ধিজীবীরা নিজের দেশের গোপন তথ্য বিদেশে পাচার করছে ফলে আমরা দুর্বল হচ্ছি এবং জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হচ্ছে।ধর্ম, কুসংস্কার ছুৎমার্গ এবং জাতিভেদ প্রথা সমস্তই ভারতবাসীকে ক্রমশ দুর্বল করে তুলেছে। সুতরাং আমাদের এই সমস্ত বাধাকে ছুঁড়ে ফেলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে নইলে জাতীয় সংহতি বিপন্ন হয়ে দেশ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। সভাপতি শ্রী সুনীত দে বললেন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের নিজেদের স্বার্থে বিভিন্ন জাতিকে ব্যবহার করেছে, এগুলি জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাফ গেমসের সূচি



যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ২০ নভেম্বর বিকেল ৩-৩০ মিনিট।

মারাথন – ২২ নভেম্বর সকাল ৭-৩০ মিনিট।

অ্যাথেলেটিকস্ – ২২ থেকে ২৫ প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩-৩০মিঃ পর্যন্ত।

ফুটবল – ২১ থেকে ২৩, প্রতিদিন বিকেল ৪-৩০ মিঃ থেকে রাত ৮-৩০ মিঃ পর্যন্ত।
২৫ নভেম্বর বিকেল ৪-৩০ মিঃ থেকে ৬-৩০মিঃ।
২৬-১১-৮৭ বিকেল ৪টা থেকে ৬টা।

খো-খো – ২১ থেকে ২৬ প্রতিদিন বিকেল ৩টে থেকে ৪টা।

নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়াম :–

ভলিবল – ২০শে সকাল ৯টা থেকে ১২টা
২১ ও ২২শে সকাল ৯টা থেকে ১১টা বিকেল ১-৩০মিঃ থেকে ৪-৩০মিঃ।
২৩শে বিকেল ৪টা থেকে ৭টা

বাস্কেটবল – ২৪শে বিকেল ২টা থেকে ৪-৩০ মিঃ
২৫ ও ২৬শে বিকেল ১টা থেকে ৪-৩০ মিঃ

বক্সিং – ২১ ও ২২শে বিকেল ৫-৩০মিঃ থেকে রাত ১০টা
২৪শে বিকেল ৫-৩০মিঃ থেকে রাত ৯টা

কুস্তি – ২৫ ও ২৬শে বিকেল ৫-৩০মিঃ

ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র :–

টেবল টেনিস – ২১ থেকে ২৩শে প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে ১২টা বিকেল ২টা থেকে ৭টা

ভারোত্তোলন – ২৪ ও ২৫শে বিকেল ১টা থেকে ৭টা
২৬শে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৭টা

সুভাষ সরোবর :–

সাঁতার – ২২ থেকে ২৫ প্রতিদিন বিকেল ১টা থেকে ৪টা

পশ্চিমবঙ্গ কবাডি সংস্থা গ্রাউন্ড :–

কবাডি – ২১, ২২ ও ২৪ প্রতিদিন বিকেল ১টা থেকে ৪টা।

২৭ নভেম্বর বিকেল সাড়ে তিনটেয় সমাপ্তি অনুষ্ঠান যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে।

মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

১৩। কে.কে. গ্রুপ, বাঁকুড়া	১,০০০.০০
১৪। সোসাইটি ফর দি ডিসট্রেসড, কলিকাতা	১০,০০১.০০
১৫। নেতাজী স্পোর্টিং ক্লাব, কলিকাতা-২	১,০০১.০০
১৬। পোশাক শিল্পী সমিতি (উত্তরাঞ্চল)	২,০০১.০০
১৭। মারওয়াড়ি যুব মঞ্চ, কলিকাতা-৭	৩,০০১.০০
১৮। পশ্চিমবঙ্গ সিনিয়র অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক এ্যাসোসিয়েশন; কলিকাতা-১২	২,৫০০.০০
১৯। চারের পল্লী দুর্গোৎসব কমিটি, যাদবপুর, কলিকাতা-৩২	৫০১.০০
২০। কৃষ্ণা গ্লাস স্টাফ এন্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, কলিকাতা-৩২	২,০০১.০০
২১। কৃষ্ণা গ্লাস দুর্গোৎসব কমিটি,কলিকাতা-৩২	২,০০১.০০
২২। কৃষ্ণা সিলিকেট এন্ড গ্লাস ওয়ার্কারস লিমিটেড, কলিকাতা-১	১,০০১.০০
২৩। কালিকিঙ্কর চ্যাটার্জি, সিমিরালি, নদিয়া	১০.০০
২৪। গুলাব চৌধুরী, শ্রীরামপুর, হুগলি	২.০০

কাঁথি মহকুমায় রামনগর ২নং ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির অগ্রগতি

২৩৭টি গ্রাম, ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ১৬২.৭৯ বর্গ কি.মি এলাকা নিয়ে অবস্থান রামনগর ২নং ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি। উক্ত এলাকায় মোট জনসংখ্যা (১৯৮১-র জনগণনায়) ৯৯,৭৮৪ জন তার মধ্যে পুঃ ৫০,৪৮৮ এবং মহিলা ৪৯,২৯৬ জন। মোট পরিবারের সংখ্যা ১৫,৬৩৫ টি। তফসিলী সম্প্রদায় পরিবারের সংখ্যা ২,৯৭৬টি, আদিবাসী পরিবারের সংখ্যা ২৫টি, ক্ষুদ্র চাষী পরিবারের সংখ্যা ১৪৫০টি, প্রান্তিক চাষী পরিবারের সংখ্যা ১৪০২টি। কৃষি শ্রমিক পরিবারের সংখ্যা ১,৩২৮, অকৃষি পরিবারের সংখ্যা ১,১৮১, শিল্পী পরিবারের সংখ্যা ১১৯টি। নথিভুক্ত বর্গাদার পরিবার ২৮৫ এবং পাট্টাদার পরিবার ১৯৬টি।

কৃষি : কৃষি প্রধান এই ব্লকে ধান চাষ ছাড়াও চীনাবাদাম, মুগ, তরমুজ, পান এবং কাজুবাদামের চাষ হয়ে থাকে। উক্ত ব্লকে সাধারণ আমন ধান চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৮৫২০ হেক্টেয়ার। উচ্চ ফলনশীল আমন ধান চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ১৫০০ হেক্টেয়ার। বরো ধান চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ১৫০০ হেক্টেয়ার, আলুর চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ২১০ হেঃ। গম চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৮০ হেঃ এবং সরিষা চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ১০.৫০ হেক্টেয়ার।

সেচ ব্যবস্থা : গভীর নলকূপ ২টি, অগভীর নলকূপ ৩২০টি, পুকুর ৩০০০ টি। সেচখাতে সরকারি ব্যয় মোট ২,৯০,৪৯৪ টাকা।

স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পের অগ্রগতি : গত ১৯৭৯-৮০ সালে সঞ্চয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৯,০০,০০০ এবং সঞ্চয়ের সংগৃহীত মোট পরিমাণ ছিল ১,২৭,৩৯৭। বামফ্রন্ট সরকারের দ্রুত অগ্রগতির ফলে ১৯৮৬-৮৭ সালে সঞ্চয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৪,০০,০০০ এবং সঞ্চয়ের সংগৃহীত মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২২,০০,০০০।

খাদ্য ও সরবরাহ : গড় বার্ষিক উৎপাদন খাদ্যশস্য ১৭,৬৬৪ মেঃ টন ডাল শস্য–২১৬ মেঃ টন, তৈল বীজ–১৪.৮০ মেঃ টন কিন্তু প্রয়োজন খাদ্যশস্য (বার্ষিক) ২২,৪৭৩.২১ টন, ডাল শষ্য–৯৭০ টন, তৈলবীজ–১১৪ টন। কেরোসিন প্রয়োজন মাসে ৯০,০০০ টন। রেপসীড তেল প্রয়োজন ১৫,০০০ টন। চিনি বছরে প্রয়োজন ৪.৮০ লক্ষ টন। চাল বছরে প্রয়োজন ২৪ লক্ষ টন এবং গম বছরে প্রয়োজন ২৪ লক্ষ টন। সেখানে কেন্দ্রীয় যোগান কেরোসিন ৪৪,০০০ টন। রেপসীড ১৩৬.৫ হাজার টন। চিনি বছরে ২.৯৫ লক্ষ টন। চাল ১৩.৩০ লক্ষ টন এবং গম ১৬.৭৫ লক্ষ টন।

শিক্ষা ও সমাজ শিক্ষা : মোট শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা ৪৮,৯০৪ জন। শিক্ষিতের হার বালক ও শিশু ৫৯ শতাংশ। বিদ্যালয় পাঠরত ছাত্রসংখ্যা–৩,৮৪১ জন। বিদ্যালয়ে যায় না এমন ছাত্র সংখ্যা–৩,৮৪১ জন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা–১২০টি। হাই ও জুঃ হাই স্কুলের সংখ্যা ২০টি। উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ১ টি, কলেজের সংখ্যা ১ টি। গ্রামীণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৫টি, সেবামূলক সংগঠনের সংখ্যা ৩৯টি, মহিলা সমিতি ১৮টি, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র ৭টি। প্রথা বহির্ভূত শিক্ষাকেন্দ্র ৫০টি। শিক্ষাখাতে ব্যয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ বাবদ ১,৯০,০০০.০০ টাকা, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গৃহ নির্মাণ বাবদ ১৫,০০০ টাকা, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র বাবদ ২০,০০০ টাকা।

জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান : বনসৃজন–২১ হেক্টেয়ার, তফসিলী সম্প্রদায় ও আদিবাসীদের

পঞ্চায়েত পরিক্রমা

জন্য গৃহ নির্মাণ–১২টি, কালভার্ট–৬টি, পঞ্চায়েত ঘর ১টি, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র–১টি, পায়খানা–১টি, মোট ব্যয়–৪,৪০,০০০ টাকা, খাদ্য–৭৭,২২০,০০০ কুঃ (১৯৮৬-৮৭-র হিসাব)।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ পরিসংখ্যান : বড় রাংকুয়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, রামনগর–২, ১৯৮৫-৮৬ সালে পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র তমলুক-এ এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র দ্বিতীয় স্থান লাভ করে এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মধ্যে ৪র্থ স্থান অধিকার করে। ১৯৮৫-৮৬ সালে মোট নির্বীজকরণ পুরুষ ৪১ জন, মহিলা ৬৬৭ জন। আই.ইউ.ডি. ৮৫, নিরোদ–২৫,৬৯৪, ওরাল পিল–২২৫, মাতৃমঙ্গল ও শিশু কল্যাণ এবং প্রতিষেধক কর্মসূচি–১৯৮৫-৮৬ সালে ট্রিপল এন্টিজেন–১১৩৩। ডাবল এন্টিজেন–১৪৪২, টিটেনাস টক্সয়েড ৫৩৭, আয়রন বড়ি (মা) ১৩৮৩, আয়রন বড়ি (শিশু) ১১৯৩। ভিটামিন এওয়েল–৬৯৩, কলেরা প্রতিষেধক টীকা–৭৪৬৭, পোলিও ভ্যাকসিন প্রথম ডোজ–৪৩৪, দ্বিতীয় ডোজ–১৫৪, যক্ষ্মা টীকা–১২২।

পলসন্ডায় গ্রামোন্নয়নে পঞ্চায়েতের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনাচক্র

গত ৩০ অক্টোবর ১৯৮৭ তারিখে পলসন্ডায় লালবাগ মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর ও নারয়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে 'গ্রামোন্নয়নে পঞ্চায়েতের ভূমিকা' শীর্ষক এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মানিক সেখ, শিক্ষক, বিষ্ণুপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রধান অতিথি ছিলেন রতন মন্ডল, সম্পাদক, কৃষিজ উন্নয়ন সমিতি, জলুখা এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন গুরুপদ মন্ডল, সদস্য, নারায়ণপুর অঞ্চল কৃষক সমিতি। অনুষ্ঠানের সূচনায় গ্রামোন্নয়নে পঞ্চায়েতের ভূমিকা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন মহকুমা তথ্য দপ্তরের ফিল্ড ওয়ার্কার দেবদাস ভট্টাচার্য। সভাপতি মানিক সেখ তার বক্তব্যে বলেন গ্রামীণ অর্থনীতির বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করে গড়ে তুলতে আজকে পঞ্চায়েতের ভূমিকা অপরিহার্য। সুতরাং এই পঞ্চায়েতের কাজকর্মের পরিধি যাতে আরও বৃদ্ধি পায় সে বিষয়ে আমরা যাতে সচেষ্ট হই তার জন্য এগিয়ে আসতে হবে আমাদের। প্রধান অতিথি শ্রীরতন মন্ডল ও বিশেষ অতিথি শ্রীগুরুপদ মন্ডল গ্রামোন্নয়নে পঞ্চায়েতের ভূমিকা সম্পর্কে বিশেষ বক্তব্য রাখেন। মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক বলেন, গ্রাম বাংলার মানুষের মধ্যে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে সাহায্য করেছে এই পঞ্চায়েত। এছাড়াও গ্রামীণ মহাজনের কবল হতে নিজেদের মুক্ত করে, পঞ্চায়েতের বিভিন্ন আর্থিক সাহায্যের পরিকল্পনায় সুযোগ গ্রহণ করতে পেরে সবাই উপকৃত হয়েছেন। মহকুমা তথ্য দপ্তরের উদ্যোগে পঞ্চায়েত সম্পর্কিত পোষ্টার প্রদর্শনী ও রাত্রে তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

নিজের জেলাকে জানুন

বারাকপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে নিজ রাজ্য সম্পর্কে প্রধান প্রধান তথ্য জানাবার এক কর্মসূচি নিয়েছেন। এরই অংগ হিসেবে সম্প্রতি বারাকপুরে জেলা তথ্য কেন্দ্রে মহাদেবানন্দ উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে 'নিজের জেলাকে জানুন' এক অনুষ্ঠান হয়। ছাত্রদের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন তথ্য জানান হয় এবং তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে জেলা ও মহকুমা তথ্য আধিকারিক শ্রীপ্রশান্ত ধর ও শ্রীঅশোক গৃহ, শিক্ষক শ্রীশংকর বসু সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

গ্রামীণ সংবাদ

বাঁকুড়ায় মৎস্য চাষের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ

বাঁকুড়া জেলায় বিগত বছর থেকে মৎস্য চাষের প্রসার ও উন্নয়নে ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ উদ্যোগ মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। চলতি বছরে ডি. পি. সি. সি. প্রকল্পে ৪ কোটি সাড়ে ২৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। যা এ যাবত জেলার জন্য সর্বোচ্চ বরাদ্দ। যা থেকে ১৬৭ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা জলাশয় সংস্কার ও জলাশয় নির্মাণ খাতে ব্যয় করা হবে এবং যার মাধ্যমে প্রায় সাড়ে দশ লক্ষ শ্রম দিবস সৃষ্টি করা যাবে। কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে এবং ইতিমধ্যেই প্রায় আড়াই লক্ষ শ্রমদিবস সৃষ্টি করা গেছে।

গত বছরের কাজের খতিয়ানটি খুবই চমকপ্রদ। জেলায় যেখানে মোট ২৩,৭৪,২০৫ জন মানুষের বাস, যাদের মধ্যে ৬,৮১,১৫৫ জন তফসিলী ও ২,৫০,২৩৪ জন আদিবাসী, তাদের মধ্যে ২২,৫৫৬টি তফসিলী পরিবার এবং ৫,৮৫৬টি আদিবাসী মৎস্যজীবী পরিবার সহ ২০,২৫২ টি সাধারণ মৎস্যজীবী পরিবারকে এই মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। গত বছর থেকেই ঐ পরিবারগুলি সুফল পেতেও শুরু করেছেন।

গত বছর সরকারি ক্ষেত্রে ৩৭০ লক্ষ বেসরকারি ক্ষেত্রে (ব্যাংকের অর্থ সাহায্যে) ৩৪০০ লক্ষ এবং মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি ও মৎস্য উৎপাদক গোষ্ঠীগুলির মাধ্যমে ২৩৫ লক্ষ ডিম পোনা (পাউস) উৎপাদন ও বণ্টন করা হয়েছে। ভোজ্য মাছ উৎপাদনের জন্য জেলায় ২২টি ব্লকের পরিত্যক্ত জলাশয়গুলির সদ্ব্যবহার করে এফ এফ. ডি. ডি.-এ প্রকল্পে ২৩০০ হেকটেয়ার, ব্যক্তিগত উদ্যোগগুলিকে উৎসাহিত করে ৬২২৫.৫ হেকটেয়ার এম. সি. সি. প্রকল্পে ১৯০ হেকটেয়ার টি. এস. পি. ও আই. টি. ডি. পি. প্রকল্পে ৭৮ হেকটেয়ার এবং মৎস্য উৎপাদক গোষ্ঠীগুলির মাধ্যমে ১০৫ হেকটেয়ার জমিতে মৎস্য চাষ করা হয়েছে।

মৎস্য চাষে সহায়তার জন্য প্রাথমিক স্তরে ৮৮০ জন, জেলা স্তরে ১৮০ জন ও রাজ্যস্তরে ১০ জন মৎস্য চাষীকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। দরিদ্র মৎস্য চাষীদের আর্থিক ঋণ ছাড়াও বিনামূল্যে ৬০০টি ফিসারীজ মিনিকিট বিতরণ করা হয়েছে। তফসিলী আদিবাসী গৃহহীন চাষীদের জন্য ৪০০টি ইন্দিরা আবাসন নির্মাণ করা হয়েছে ও তা বিতরণ করা হয়েছে। তফসিলী ধীবর ও আদিবাসী মহিলাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে মাছ ধরা জাল বুনন, বিক্রয় এবং ভোজ্য মাছ সংগ্রহ, রক্ষণ ও বিক্রয় ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও স্ব-নিযুক্তির জন্য ৮২০ জন মহিলাকে মূলধন দেওয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট জেলা দপ্তর থেকে উপরোক্ত তথ্য জানিয়ে আরও বলা হয়েছে জেলায় ২টি মৎস্য গবেষণাগার স্থাপন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কাজে প্রযুক্তিগত সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। মৎস্যজীবীদের আকস্মিক দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণের জন্য তিন হাজার বীমা প্রকল্প করা হয়েছে।

চলতি বছরে কংসাবতী জলাধারে ৪৬০০ হেকটেয়ার মাছ চাষের জন্য কংসাবতী কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে এবং খরা প্রকোপিত ৭টি ব্লকে সরকারি খামার ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে ২৩৪ হেকটেয়ার মাছ চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে আরও জানানো হয়েছে যে, আগামী বছরের জন্য ৩১৭ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকার একটি উন্নত পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে। যে পরিকল্পনায় গরিব ও সাধারণ মৎস্যচাষীদের জন্য আরও নতুন নতুন সুযোগের সংস্থান রাখা হয়েছে।



বাঁকুড়া জেলার প্রয়াত সভাধিপতি দীনবন্ধু মহান্তী ছবি—নিত্যগোপাল ঘোষ

বাঁকুড়া জেলা সভাধিপতি দীনবন্ধু মহান্তীর জীবনাবসান

বাঁকুড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি, বিশিষ্ট শিক্ষকনেতা ও বাঁকুড়া জেলা সি.পি.এম জেলা কমিটির সদস্য শ্রীদীনবন্ধু মহান্তী গত ১ নভেম্বর '৮৭ সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ কলকাতার এস.এস.কে. এম হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল তিপান্ন বছর। তিনি তাঁর সরল ব্যবহার ও কর্মপটুতার জন্য দলের ও জেলা প্রশাসনের সকলেরই খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন।

মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁর মরদেহ দলের রাজ্য দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্যরা তাঁর মরদেহে মাল্যদান করেন।

তাঁর জন্মভূমি দক্ষিণ বাঁকুড়ার সারেংগা ব্লকের জামবনী গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানকার শ্মশানঘাটে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

সংক্ষিপ্ত জীবনী : দীনবন্ধু মহান্তী ১৯৩৪ সালে ৩১ ডিসেম্বর জামবনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পড়াশুনো করেন বাঁকুড়া জেলাস্কুল, খ্রীশ্চান কলেজ, বিষ্ণুপুর-এর রামানন্দ কলেজ ও ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে। ১৯৫১ সালে ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি অবিভক্ত সিপিআই দলে যোগদান করেন। পরে '৬৪ সালে দল বিভক্ত হলে সিপিএম দলে চলে আসেন। '৫৬ সাল থেকে তিনি জামবনী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তিনি পঞ্চায়েত নির্বাচনের 'প্রথম থেকেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং প্রতিবার জয়ী হন। '৮৫ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি জেলা সভাধিপতির দায়িত্বে আসেন।

বেকারদের জন্য স্ব-নির্ভর প্রকল্প ও আর্থিক স্বয়ম্ভরতাঃ আলোচনাচক্র

তমলুক মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক শ্রী প্রহ্লাদ মুখোপাধ্যায়-এর পরিচালনায় তমলুক মহকুমা তথ্য কেন্দ্রে ৯-১১-৮৭ তারিখ বিকাল ৩ টায় প্রতিনিধিত্বমূলক শিক্ষিত বেকার, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, মধ্যবিত্ত ও স্বনির্ভর প্রকল্পে সাহায্যপ্রাপ্ত যুবক-যুবতীদের উপস্থিতিতে নথিভুক্ত বেকারদের সহায়তা এবং স্বনির্ভর প্রকল্পের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনাচক্রে সভাপতিত্ব করেন মহকুমা শাসক, তমলুক। প্রধান অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক, তমলুক। আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করেন জেলা কর্মবিনিয়োগ আধিকারিক, তমলুক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কর্ম-বিনিয়োগের উপ-অধিকর্তা, হলদিয়া কেন্দ্রের কর্ম-বিনিয়োগ আধিকারিক।

সভার প্রারম্ভে কর্ম-বিনিয়োগের উপ-অধিকর্তা বলেন–দেশে বেকারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু চাকুরি সৃষ্টির পরিমাণ দিন দিন কমছে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৭৮ সালে ভারতের মধ্যে সর্বপ্রথম পশ্চিমবঙ্গে বেকার ভাতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। তখন থেকে বেকারভাতা চালু হয়। বৎসরের কোন এক সময় খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নথিভুক্ত বেকারদের মধ্যে যাদের নাম পাঁচ বৎসরেরও বেশি কর্ম-বিনিয়োগ কেন্দ্রে নথিভুক্ত আছে তাদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। দরখাস্তগুলির মধ্যে থেকে সঠিক লোককে বেকার ভাতা প্রদান করা হয়। শুধুমাত্র বেকারভাতা প্রদানের মাধ্যমে বেকারী কমানো সম্ভব নয় এই কথা চিন্তা করেই ১৯৮৫ সালে বর্তমান সরকার স্ব-নিযুক্তি প্রকল্পের মাধ্যমে ঋণ দানের কথা ঘোষণা করেন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে নথিভুক্ত বেকাররা ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য ঋণ পেতে পারেন। এই ঋণের সর্বোচ্চ হার বর্তমানে ৩৫ হাজার টাকা। এই ঋণের এক চতুর্থাংশ সরকার ভরতুকি হিসাবে দেন। বর্তমান বৎসরের জুন মাস পর্যন্ত মেদিনীপুর জোনাল এরিয়াতে ২৪ হাজার প্রকল্প জমা পড়ে এবং তার মধ্যে ১৫ হাজার প্রকল্প মঞ্জুর করা হয়েছে। এইসব প্রকল্পের জন্য প্রথমে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। পরে স্ক্রিনিং কমিটিতে তা পাঠানো হয়। তাঁরা দরখাস্তগুলির মধ্যে যেগুলি গ্রহণযোগ্য তা বেছে নিয়ে ব্যাঙ্কে পাঠান। পরে ব্যাঙ্ক তা মঞ্জুর করে। তবে অনেক সময় দেখা যায় উপযুক্ত পরিকল্পনার অভাবে অনেক প্রকল্প বাতিল হয়ে যায়। এই প্রকল্প তৈরি সম্পর্কে বিভিন্ন কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র থেকে বুকলেট বিলি করা হয়। এই সম্পর্কে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকও থাকেন। সেখানে যোগাযোগ করে স্কিম তৈরি করে নিতে কোন অসুবিধা হবে না। তাঁরা আপনাদের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।

এরপর বক্তব্য রাখেন জেলা কর্মবিনিয়োগ আধিকারিক-তমলুক। তিনি বলেন, এই রাজ্যে নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা প্রায় ৪২ লাখ যার মধ্যে কর্ম-বিনিয়োগ কেন্দ্রের মাধ্যমে চাকুরি পান শতকরা ৮ জন। সমস্ত বেকারকে চাকুরি দেওয়া সম্ভব নয় এই কথা চিন্তা করেই সরকার স্ব-নিযুক্তি প্রকল্পের সিদ্ধান্ত নেন। বর্তমান বৎসরে রাজ্যে মোট ৬০ হাজারটি, আমাদের মেদিনীপুর জেলায় ৪১৫০ ও তমলুক ও হলদিয়া কর্মবিনিয়োগ এলাকায় ৬০০টি করে প্রকল্প মঞ্জুর করা হবে।এইসব প্রকল্পের জন্য আবেদনপত্রগুলি ইতিমধ্যেই স্ক্রিনিং কমিটিতে পাঠানো হয়েছে। স্ক্রিনিং কমিটি তা পরীক্ষা করে দেখছেন। মনে হচ্ছে এই বৎসরের শেষের দিকে এগুলি মঞ্জুর করা সম্ভব হবে। তবে দরখাস্তগুলিতে যে স্কিম দেওয়া আছে তার বেশির ভাগেরই আবেদন একই প্রকার প্রকল্পের জন্য। তা না করে যদি বিভিন্ন প্রকার প্রকল্পের (যেখানে যা প্রযোজ্য) জন্য আবেদন করা হতো তাহলে এগুলি বাছাই করার কাজ দ্রুত সম্পাদিত হতে পারত। প্রার্থী বাছাই-এর সময় যে বিষয়গুলির প্রতি নজর দেওয়া হয় তা হলো–১। প্রকল্প সম্পর্কে অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ এবং এই সম্পর্কে প্রকল্পের ভবিষ্যৎ কি? ২। ব্যবসায়ের স্থান ৩। স্কিম সম্পর্কে ধ্যান ধারণা ও আগ্রহ। এমন অনেক দরখাস্তকারী আছেন যারা নিজেদের স্কিম সম্পর্কে কিছুই জানেন না।

তারপর বক্তব্য রাখেন জনপ্রতিনিধি শ্রী কালোবরণ ঘোষ, তিনি সরকারের এই উদ্যোগ থেকে কিছু সুযোগসন্ধানী মানুষ কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রগুলির আশপাশ থেকে প্রচুর অর্থ রোজগার করছেন বলে অভিযোগ করেন। স্বনির্ভর প্রকল্পের জন্য যে নির্দিষ্ট স্কিম প্রয়োজন তা ২০০-৫০০ টাকা পর্যন্ত নগদ মূল্যে অভাবী বেকারদের কাছে নানা প্রলোভন দেখিয়ে বিক্রি করে থাকে। যারা কেনেন তারা এর ভালো মন্দ কিছুই জানেন না। কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে বাছাই-এর সময় দেখা যায় এগুলি ত্রুটিপূর্ণ কোনটি বা কোন প্রকল্পই পর্যায়ভুক্তই নয়। তিনি এ ব্যাপারে প্রশাসনের উচ্চতর পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন।

এরপর স্বনির্ভর প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা প্রাপ্ত যুবক-যুবতীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন শ্রীনীহাররঞ্জন হাইত (রৌপ্যকার), স্বপ্না দাস (রেডিমেট জামাকাপড়), অসিত সামন্ত, শচীনন্দন জানা (সার), অশোক বেরা, নিধুরাম ভট্টাচার্য, সন্ধ্যা বেরা প্রমুখ সকলেই মাত্র ২৫ হাজার টাকা একটি প্রকল্পের পক্ষে যথেষ্ট নয় বলে উল্লেখ করেন এবং বিষদ আলোচনায় ব্যবসার বিভিন্ন বাস্তব অসুবিধার কথা বলেন।

পরে সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন প্রদীপ পত্রিকার সম্পাদক, শ্রীচিত্ত কুন্ডু ও তাম্রলিপ্ত পত্রিকার প্রতিনিধি। শ্রী কুন্ডু ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, অনেক ব্লকে শিল্প সম্প্রসারণের আধিকারিক-এর পদ থাকলেও লোক নেই। স্ব-নির্ভর ইচ্ছুক বেকারদের সত্যিকারের পরিচালনের অভাব রয়েছে। এ সম্পর্কে সরকারের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

এরপর বক্তব্য রাখেন এই আলোচনাচক্রের উদ্যোক্তা মহকুমা তথ্য আধিকারিক। তিনি বলেন, এই ধরনের আলোচনাচক্র আয়োজনের তাৎপর্য অপরিসীম। গত আর্থিক বছরে ৪টি, বর্তমান আর্থিক বছরে ৫টি সরকারের বিভিন্ন নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে সাধারণের পরিচয় ঘটানোর জন্য মোট নয়টি আলোচনাচক্র আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে। তিনি এর পর সংক্ষেপে বর্তমান সরকারের কর্ম-বিনিয়োগের নীতি বিশ্লেষণ করে বলেন–কর্ম-বিনিয়োগের সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও ত্রুটি-বিচ্যুতি যে আছে তা স্বীকার করে বলেন বিভিন্ন পক্ষ আজকের এই আলোচনাচক্রের গুরুত্ব এবং কার্যকারিতা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন। তবে বর্তমান সরকারের কর্মবিনিয়োগের নীতিতে যে গুণগত পরিবর্তন এসেছে এই জমায়েতে বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট পক্ষ এবং প্রশাসনের আলোচনার মধ্য দিয়ে তা প্রকাশিত হয়েছে। ত্রুটিগুলি মুক্তির জন্য তিনি গণ-উদ্যোগের কথা বলেন। ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা দানের ক্ষেত্রগুলিতে কোথায় কোথায় অসুবিধা দেখা দেয় তা নির্দিষ্ট বক্তাদের বিষদভাবে বলার জন্য তিনি তমলুক ইউ. বি. আই.-এর ভারপ্রাপ্ত জোনাল অফিসার শ্রীশচীন দে-কে অনুরোধ করেন। শ্রী দে এ বিষয়ে ব্যাঙ্কের প্রতিবন্ধকতার দিকগুলি তুলে ধরেন।

প্রধান অতিথি অতিরিক্ত জেলা শাসক, তমলুক মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের বক্তব্যের জের টেনে বলেন যে কোন কর্ম-বিনিয়োগ কেন্দ্রে কোন রকম দুর্নীতি যাতে ঘটতে না পারে সেজন্য তিনি সচেতন এবং ইতিমধ্যেই

□(পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কোন প্রকল্পই পর্যায়ভুক্তই নয়। তিনি এ ব্যাপারে প্রশাসনের উচ্চতর পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন।

বেকারদের জন্য স্ব-নির্ভর প্রকল্প ও আর্থিক স্বয়ম্ভরতা : আলোচনাচক্র

তমলুক মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক শ্রী প্রহ্লাদ মুখোপাধ্যায়-এর পরিচালনায় তমলুক মহকুমা তথ্য কেন্দ্রে ৯-১১-৮৭ তারিখ বিকাল ৩ টায় প্রতিনিধিত্বমূলক শিক্ষিত বেকার, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, মধ্যবিত্ত ও স্বনির্ভর প্রকল্পে সাহায্যপ্রাপ্ত যুবক-যুবতীদের উপস্থিতিতে নথিভুক্ত বেকারদের সহায়তা এবং স্বনির্ভর প্রকল্পের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনাচক্রে সভাপতিত্ব করেন মহকুমা শাসক, তমলুক। প্রধান অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক, তমলুক। আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করেন জেলা কর্মবিনিয়োগ আধিকারিক, তমলুক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কর্ম-বিনিয়োগের উপ-অধিকর্তা, হলদিয়া কেন্দ্রের কর্ম-বিনিয়োগ আধিকারিক।

সভার প্রারম্ভে কর্ম-বিনিয়োগের উপ-অধিকর্তা বলেন—দেশে বেকারের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু চাকুরি সৃষ্টির পরিমাণ দিন দিন কমছে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯৭৮ সালে ভারতের মধ্যে সর্বপ্রথম পশ্চিমবঙ্গে বেকার ভাতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। তখন থেকে বেকারভাতা চালু হয়। বৎসরের কোন এক সময় খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নথিভুক্ত বেকারদের মধ্যে যাদের নাম পাঁচ বৎসরেরও বেশি কর্ম-বিনিয়োগ কেন্দ্রে নথিভুক্ত আছে তাদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। দরখাস্তগুলির মধ্যে থেকে সঠিক লোককে বেকার ভাতা প্রদান করা হয়। শুধুমাত্র বেকারভাতা প্রদানের মাধ্যমে বেকারী কমানো সম্ভব নয় এই কথা চিন্তা করেই ১৯৮৫ সালে বর্তমান সরকার স্ব-নিযুক্তি প্রকল্পের মাধ্যমে ঋণ দানের কথা ঘোষণা করেন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে নথিভুক্ত বেকাররা ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য ঋণ পেতে পারেন। এই ঋণের সর্বোচ্চ হার বর্তমানে ৩৫ হাজার টাকা। এই ঋণের এক চতুর্থাংশ সরকার ভরতুকি হিসাবে দেন। বর্তমান বৎসরের জুন মাস পর্যন্ত মেদিনীপুর জোনাল এরিয়াতে ২৪ হাজার প্রকল্প জমা পড়ে এবং তার মধ্যে ১৫ হাজার প্রকল্প মঞ্জুর করা হয়েছে। এইসব প্রকল্পের জন্য প্রথমে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। পরে স্ক্রিনিং কমিটিতে তা পাঠানো হয়। তাঁরা দরখাস্তগুলির মধ্যে যেগুলি গ্রহণযোগ্য তা বেছে নিয়ে ব্যাংকে পাঠান। পরে ব্যাংক তা মঞ্জুর করে। তবে অনেক সময় দেখা যায় উপযুক্ত পরিকল্পনার অভাবে অনেক প্রকল্প বাতিল হয়ে যায়। এই প্রকল্প তৈরি সম্পর্কে বিভিন্ন কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র থেকে বুকলেট বিলি করা হয়। এই সম্পর্কে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকও থাকেন। সেখানে যোগাযোগ করে স্কিম তৈরি করে নিতে কোন অসুবিধা হবে না। তাঁরা আপনাদের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।

এরপর বক্তব্য রাখেন জেলা কর্মবিনিয়োগ আধিকারিক-তমলুক। তিনি বলেন, এই রাজ্যে নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা প্রায় ৪২ লাখ যার মধ্যে কর্ম-বিনিয়োগ কেন্দ্রের মাধ্যমে চাকুরি পান শতকরা ৮ জন। সমস্ত বেকারকে চাকুরি দেওয়া সম্ভব নয় এই কথা চিন্তা করেই সরকার স্ব-নিযুক্তি প্রকল্পের সিদ্ধান্ত নেন। বর্তমান বৎসরে রাজ্যে মোট ৬০ হাজারটি, আমাদের মেদিনীপুর জেলায় ৪১৫০ ও তমলুক ও হলদিয়া কর্মবিনিয়োগ এলাকায় ৬০০টি করে প্রকল্প মঞ্জুর করা হবে। এইসব প্রকল্পের জন্য আবেদনপত্রগুলি ইতিমধ্যেই স্ক্রিনিং কমিটিতে পাঠানো হয়েছে। স্ক্রিনিং কমিটি তা পরীক্ষা করে দেখছেন। মনে হচ্ছে এই বৎসরের শেষের দিকে এগুলি মঞ্জুর করা সম্ভব হবে। তবে দরখাস্তগুলিতে যে স্কিম দেওয়া আছে তার বেশির ভাগেরই আবেদন একই প্রকার প্রকল্পের জন্য। তা না করে যদি বিভিন্ন প্রকার প্রকল্পের (যেখানে যা প্রযোজ্য) জন্য আবেদন করা হতো তাহলে এগুলি বাছাই করার কাজ দ্রুত সম্পাদিত হতে পারত। প্রার্থী বাছাই-এর সময় যে বিষয়গুলির প্রতি নজর দেওয়া হয় তা হলো—১। প্রকল্প সম্পর্কে অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ এবং এই সম্পর্কে প্রকল্পের ভবিষ্যৎ কি? ২। ব্যবসায়ের স্থান ৩। স্কিম সম্পর্কে ধ্যান ধারণা ও আগ্রহ। এমন অনেক দরখাস্তকারী আছেন যারা নিজেদের স্কিম সম্পর্কে কিছুই জানেন না।

তারপর বক্তব্য রাখেন জনপ্রতিনিধি শ্রী কালোবরণ ঘোষ, তিনি সরকারের এই উদ্যোগ থেকে কিছু সুযোগসন্ধানী মানুষ কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রগুলির আশপাশ থেকে প্রচুর অর্থ রোজগার করছেন বলে অভিযোগ করেন। স্বনির্ভর প্রকল্পের জন্য যে নির্দিষ্ট স্কিম প্রয়োজন তা ২০০-৫০০ টাকা পর্যন্ত নগদ মূল্যে অভাবী বেকারদের কাছে নানা প্রলোভন দেখিয়ে বিক্রি করে থাকে। যারা কেনেন তারা এর ভালো মন্দ কিছুই জানেন না। কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে বাছাই-এর সময় দেখা যায় এগুলি ত্রুটিপূর্ণ কোনটি বা কোন প্রকল্পই পর্যায়ভুক্তই নয়। তিনি এ ব্যাপারে প্রশাসনের উচ্চতর পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন।

এরপর স্বনির্ভর প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা প্রাপ্ত যুবক-যুবতীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন শ্রীনীহাররঞ্জন হাইত (রৌপ্যকার), স্বপ্না দাস (রেডিমেট জামাকাপড়), অসিত সামন্ত, শচীনন্দন জানা (সার), অশোক বেরা, নিধুরাম ভট্টাচার্য, সন্ধ্যা বেরা প্রমুখ সকলেই মাত্র ২৫ হাজার টাকা একটি প্রকল্পের পক্ষে যথেষ্ট নয় বলে উল্লেখ করেন এবং বিষদ আলোচনায় ব্যবসার বিভিন্ন বাস্তব অসুবিধার কথা বলেন।

পরে সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন প্রদীপ পত্রিকার সম্পাদক, শ্রীচিত্ত কুণ্ডু ও তাম্রলিপ্ত পত্রিকার প্রতিনিধি। শ্রী কুণ্ডু ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, অনেক ব্লকে শিল্প সম্প্রসারণের আধিকারিক-এর পদ থাকলেও লোক নেই। স্ব-নির্ভর ইচ্ছুক বেকারদের সত্যিকারের পরিচালনের অভাব রয়েছে। এ সম্পর্কে সরকারের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

এরপর বক্তব্য রাখেন এই আলোচনাচক্রের উদ্যোক্তা মহকুমা তথ্য আধিকারিক। তিনি বলেন, এই ধরনের আলোচনাচক্র আয়োজনের তাৎপর্য অপরিসীম। গত আর্থিক বছরে ৪টি, বর্তমান আর্থিক বছরে ৫টি সরকারের বিভিন্ন নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে সাধারণের পরিচয় ঘটানোর জন্য মোট নয়টি আলোচনাচক্র আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে। তিনি এর পর সংক্ষেপে বর্তমান সরকারের কর্ম-বিনিয়োগর নীতি বিশ্লেষণ করে বলেন—কর্ম-বিনিয়োগের সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও ত্রুটি-বিচ্যুতি যে আছে তা স্বীকার করে বলেন বিভিন্ন পক্ষ আজকের এই আলোচনাচক্রের গুরুত্ব এবং কার্যকারিতা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন। তবে বর্তমান সরকারের কর্মবিনিয়োগের নীতিতে যে গুণগত পরিবর্তন এসেছে এই জমায়েতে বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট পক্ষ এবং প্রশাসনের আলোচনার মধ্য দিয়ে তা প্রকাশিত হয়েছে। ত্রুটিগুলি মুক্তির জন্য তিনি গণ-উদ্যোগের কথা বলেন। ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা দানের ক্ষেত্রগুলিতে কোথায় কোথায় অসুবিধা দেখা দেয় তা নির্দিষ্ট বক্তাদের বিষদভাবে বলার জন্য তিনি তমলুক ইউ. বি. আই.-এর ভারপ্রাপ্ত জোনাল অফিসার শ্রীশচীন দে-কে অনুরোধ করেন। শ্রী দে এ বিষয়ে ব্যাঙ্কের প্রতিবন্ধকতার দিকগুলি তুলে ধরেন।

প্রধান অতিথি অতিরিক্ত জেলা শাসক, তমলুক মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের বক্তব্যের জের টেনে বলেন যে কোন কর্ম-বিনিয়োগ কেন্দ্রে কোন রকম দুর্নীতি যাতে ঘটতে না পারে সেজন্য তিনি সচেতন এবং ইতিমধ্যেই

□(পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

৩২তম ব্লক সম্মেলন

গত ২৯-১০-৮৭ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ ৪র্থ শ্রেণী (গ্রুপ ডি) সরকারি কর্মচারী সমিতির ৩২তম ব্লক সম্মেলন ভাবগম্ভীর ভাবে এগরা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সমিতি দপতরে অনুষ্ঠিত হল। উক্ত সম্মেলনে ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের পক্ষ থেকে ১০ জন এবং নিজস্ব সংগঠনের পক্ষ থেকে ৬০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনের মূল বিষয়বস্তু ছিল বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রান্ত অর্থনীতি সহ অযোগ্যতা প্রমাণ সহ আগামী দিনের অন্তবর্তী নির্বাচন ও কর্মচারীদের সাফল্য ও সমস্যার বিস্তারিত আলোচনা করা। উক্ত সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তব্য রাখেন এগরা ব্লক কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক শ্রীরাজেন আচার্য। শ্রীঅজয় মজুমদার এবং শ্রীআনোয়ার হোসেন যথাক্রমে সভাপতি এবং সহ-সভাপতি, শ্রীহিমাংশুশেখর খিলা এবং শ্রীবেণীমাধব দাস যথাক্রমে সম্পাদক এবং সহ-সম্পাদক। শ্রী অষ্টম মান্ডী কোষাধ্যক্ষ এছাড়া ৬ জন সদস্য সহ মোট ১১ জনের একটি কমিটি আগামী ২ বছরের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে নির্ধারিত হয় উক্ত সম্মেলনে।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মৎস্যজীবীদের সার্টিফিকেট দান

সামুদ্রিক সম্পদ রপ্তানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এম পি ই ডি এ) মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম ২নং ব্লকের তেরাপেক্ষা গ্রামে নোনা জলে চিংড়ি মাছ চাষের বিষয়ে যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলো, শুক্রবার এক অনুষ্ঠানে সেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মৎস্য-চাষীদের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। সার্টিফিকেট প্রদান করেন মৎস্যমন্ত্রী শ্রীকিরণময় নন্দ। ২০জন মৎস্য-চাষী এদিন সার্টিফিকেট পান।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন সংস্থার অধিকর্তা ডঃ এস শক্তিভেল। সভাপতিত্ব করেন শ্রীকিরণময় নন্দ। স্থানীয় বিধায়ক শ্রীশশীপ্রসাদ বল মৎস্য সচিব শ্রীসুজিত ব্যানার্জি এবং মৎস্য অধিকর্তা শ্রীঅশোক কুমার পট্টনায়েক প্রমুখ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

শ্রীকিরণময় নন্দ বলেন, চিংড়িমাছ চাষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। কিন্তু আমাদের রাজ্যে এই মাছ চাষের জন্য সহায়ক সমস্তরকম প্রাকৃতিক সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার উল্লেখযোগ্য কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করছে না। এবিষয়ে কেন্দ্রের সাথে অনেকবার আলাপ আলোচনা হয়েছে। কোনো ফলই হয়নি। তিনি বলেন, নন্দীগ্রামের পাশেই একটি নতুন দ্বীপ নয়াচক বাগদা-চিংড়ি চাষের জন্য খুবই উপযুক্ত। কেন্দ্রীয় সরকারের কোনরকম আর্থিক সাহায্য না পেয়ে অবশেষে রাজ্য সরকার ঐ নয়াচকে চিংড়ি মাছ চাষের একটি বড় ধরনের খামার নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করেছে। পরকল্পটি রূপায়িত হলে নানাভাবে পনেরো হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে। বছরে পাঁচ হাজার টন চিংড়ি মাছ উৎপন্ন হবে। প্রচুর বিদেশী মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। সীমাবদ্ধ আর্থিক ক্ষমতার মধ্যেও রাজ্য সরকার এই সমস্ত বড়বড় প্রকল্প গ্রহণ করছে।

এই জেলায় চিংড়ি মাছ চাষের উন্নয়নের জন্য দুর্গাচকে একটি নতুন অফিস খোলা হয়েছে। এই অফিস থেকে চাষীরা যাতে সহজে ব্যাংক ঋণ পেতে পারে তার চেষ্টা করা হবে।

স্বল্পসঞ্চয় বিষয়ক আলোচনাচক্র

১৬.১০.৮৭ চন্দ্রকোণা ২নং ব্লকের অন্তর্গত দিয়াগেড়্যা গ্রামে দিয়াগেড়্যা সার্বিক পল্লী কল্যাণ কেন্দ্র ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বল্প সঞ্চয় বিভাগের যৌথ উদ্যোগে একটি আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সার্বিক গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের উপদেষ্টা শ্রীবিমল চন্দ্র পাল, প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন যথাক্রমে শ্রীশান্তিপ্রসাদ ঘোষ, চন্দ্রকোণা ২নং ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ও শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস, স্বল্প সঞ্চয় বিভাগের সহ অধিকর্তা (তমলুক)।

আলোচনা শেষে সংস্থার পক্ষ থেকে নাটক পরিবেশন করা হয়।

একোয়াটিক সেন্টারের দশ কিঃমিঃ সাঁতার প্রতিযোগিতা

চন্দননগর একোয়াটিক সেন্টারের সক্রিয় ব্যবস্থাপনায় হুগলি জোড়াঘাট-চন্দননগর স্ট্র্যান্ড দশ কিঃমিঃ নবম সারা বাংলা সাঁতার প্রতিযোগিতা গত ২২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে। মোট ৩১ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ৪জন মেয়েও ছিল। ছেলেদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতয় স্থান পায় যথাক্রমে তপন ঘোষ শ্যামনগর (৪৬ মিঃ ৫৫ সেঃ), সঞ্জয় দাস-কলেজ স্কোয়ার, কলিঃ (৪৭ মিঃ ৩৭ সেঃ), অমর বসাক-রানাঘাট (৪৮ মিঃ ৯ সেঃ)। মেয়েদের মধ্যে শ্রীরামপুরের মীনা থাপা প্রথম, উত্তর ২৪ পরগনার ঝর্না মহান্ত দ্বিতীয় ও ভদ্রেশ্বরের বর্নালী মিত্র মজুমদার তৃতীয় হয়েছে।

চন্দননগর একোয়াটিক সেন্টারের সাঁতার প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে স্থানীয় পুরপ্রধান অমিয়কুমার দাস সভাপতিত্ব করলেন। প্রধান ও বিশেষ অতিথি ছিলেন অমিয় নন্দী, বিধায়ক সন্ধ্যা চট্টোপাধ্যায়।

ব্রতচারী নৃত্যালি প্রতিযোগিতা

হুগলি জেলার ভদ্রেশ্বর তেলিনীপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে গত ২২ সেপ্টেম্বর বিকেলে এক "ব্রতচারী নৃত্যালির" আয়োজন করেছিল চন্দননগর ব্রতচারী শুভকেন্দ্র।

বৈদ্যবাটি মিলন ব্যায়াম সমিতি প্রথম হয়ে গুরুজী বলাইজী চ্যালেঞ্জ শীল্ড, চন্দননগর যুবসংঘ-গ বিভাগে দ্বিতীয় হয়ে ইন্দিরা গান্ধী চ্যালেঞ্জ কাপ এবং যুবসংঘ-ক বিভাগে তৃতীয় হয়ে সরোজনলিনী চ্যালেঞ্জ শীল্ড লাভ করে। ঊষাঙ্গিনী বালিকা বিদ্যালয়ের সোমা ভট্টাচার্য একক শ্রেষ্ঠ হয়েছে। বাংলার ব্রতচারী সমিতির প্রতিনিধি ও সদ্য সোভিয়েত রাশিয়া প্রত্যাগতা বানীব্রত মুখোপাধ্যায় ও অশোককুমার রাড়ত পুরস্কার বিতরণ করেন।

(পূর্ব পৃষ্ঠার পর)

স্বনির্ভর প্রকল্প

কেন্দ্রগুলি থেকে যেসকল প্রার্থী বাছাই-এর তালিকা পাওয়া গেছে তা মহকুমা তথ্যকেন্দ্রে কেন্দ্র ইত্যাদি স্থানে ঝুলিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, কোন ব্যাংক থেকে অনুমোদিত টাকার নির্দিষ্ট ব্যাংক ড্রাফ্ট উদ্যোগীদের হাতে আসতে তিন-চার দিনের বেশি সময় লাগার কথা নয়। এ সম্পর্কে মানুষের কোন অভিযোগ থাকলে তিনি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন।

সভাপতির ভাষণে মহকুমা শাসক, তমলুক বলেন যে স্বনির্ভরতা প্রকল্প বেকারদের জন্য সহায়তার একটি বাস্তবসম্মত দিক। বর্তমান সরকার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে সমস্ত বেকারদের চাকুরি দেওয়া যাচ্ছে না বলে এই কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। এই প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে কিছু ত্রুটি থাকতে পারে কিন্তু সেসব ত্রুটিবিচ্যুতি মুক্ত হতেই হবে। এজন্য জনপ্রতিনিধিদেরও অনেক দায়িত্ব আছে। কোন কোন ব্লকে শিল্প সম্প্রসারণ আধিকারিক না থাকলেও যদি দুটি ব্লকের জন্যও একজন থাকেন তবে তাঁর সময়সীমা বেঁধে দিয়ে কাজ করতে হবে। তিনি সাংবাদিক বন্ধুদের সম্পর্কে বলেন যে, মানুষের অভাব-অভিযোগগুলি প্রশাসনের গোচরীভূত করা সাংবাদিকদের কাজ। তবে এই ধরনের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তাঁরা অনেক সময় গ্যালারীর দিকে তাকিয়ে বক্তব্য রাখেন। তাতে তা অনেক সময় অতিকথন হয়ে পড়ে। তবে আজকের এই আলোচনাচক্রের গুরুত্ব সম্পর্কে সবাই যে সজাগ তা বোঝা গেছে। সভাপতি হিসাবে এটাই সুবিধা যে এই সম্পর্কে অনেকে অনেক কথাই বলে দিয়েছেন। তিনি আলোচনাচক্র সংগঠনের জন্য মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ এবং কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

বগুলায় পুতুল নাচের রাজ্য ওয়ার্কশপ

পনের হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে গত ৩১ অক্টোবর নদীয়া জেলায় বগুলায় হাইস্কুলের মাঠে সন্ধ্যেবেলায় ঐতিহ্যমণ্ডিত বাংলার সুতোর পুতুল নাচ অনুষ্ঠিত হয়। পুতুল নাচে এত বড় সমাবেশ ইতিপূর্বে হয় নি। পুতুল নাচের আয়োজিত ওয়ার্কশপ উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানটি হয়। পুতুল নাট্য সংঘ কর্তৃক 'লালন ফকির' পালাটি প্রদর্শিত হয়। ঐতিহ্যমণ্ডিত পুতুল নাচের বিষয়বস্তুতে কালোপযোগী পরিবর্তন আসছে। দর্শক এবং শিল্পী সমাজ সেই পরিবর্তনকে সাদরে গ্রহণ করেছেন এই অনুষ্ঠানটি তার একটি দৃষ্টান্ত। সুতোর পুতুলের পূর্বে একই মঞ্চে ওইদিন মেদিনীপুর 'বেনী পুতুল' নাচ প্রদর্শিত হয়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে সুতোর বা তারের পুতুলের প্রচলন বাড়ছে। পশ্চিমবঙ্গের সাত-আটটি জেলাতে তারের পুতুলের দল গড়ে উঠেছে যদিও এর প্রধান কেন্দ্র নদীয়া জেলার রানাঘাট মহকুমার বগুলার আশে পাশের গ্রামে। অবিভক্ত বাংলার খুলনা, ফরিদপুর জেলার শিল্পীরা দেশ ভাগ হবার পর নদীয়ায় এসে এই নাচের প্রচলন করেন, তাদের কেউ কেউ এখনও জীবিত আছেন, যদিও বয়সে বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন।



অনুষ্ঠানের সূচনায় পতাকা উত্তোলন করছেন শ্রীসুধী প্রধান। পশ্চাৎপটে পুতুল নাচের পুতুলের সমাবেশ

পশ্চিমবঙ্গে 'ডাং পুতুল', 'বেনী পুতুল', 'লাঠি পুতুল' এবং 'সুতোর পুতুল' নাচের দল আছে। এই দলগুলি মেদিনীপুর, ২৪ পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় রয়েছে।

এই চার প্রকার পুতুল নাচের শিল্পীদের নিয়ে প্রথম ওয়ার্কশপ ও প্রদর্শন গত ৩০ এবং ৩১ অক্টোবর ১৯৮৭ নদীয়া জেলা বগুলাতে অবস্থিত হারানচন্দ্র শরৎচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যাপীঠে অনুষ্ঠিত হয়। এতে মুর্শিদাবাদ, ২৪ পরগনা উত্তর ও দক্ষিণ, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং নদীয়া জেলার ৫৬ জন শিল্পী যোগদান করেন। ঐতিহ্যমণ্ডিত বাংলার পুতুল নাচের শিল্পীদের এ ধরনের সমাবেশ ইতিপূর্বে হয়নি। রাজ্য লোক সংস্কৃতি পর্ষদের পরামর্শে রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ এর আয়োজন করেন। নদীয়া জেলা লোক সংস্কৃতি পর্ষদ এবং বগুলার বিভিন্ন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এতে সহায়তা করেন।

রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের পক্ষ থেকে ভারপ্রাপ্ত উপ তথ্য আধিকর্তা শ্রীমানিক সরকার ১৯৮১ সনের জুন-জুলাই মাসে বাংলার ঐতিহ্যমণ্ডিত পুতুল নাচের একটা প্রাথমিক সমীক্ষা করেন এবং সমীক্ষার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন ১৯৮১ সনের ৫ আগস্ট রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের নিকট পেশ করেন। লোক সংস্কৃতি পর্ষদেও প্রাথমিক আলোচনা হয়। এর সূত্র ধরে ১৯৮২'র ১৭, ১৮ ডিসেম্বর কলকাতায় শিশির মঞ্চে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে বাংলার ঐতিহ্যমণ্ডিত পুতুল নাচের প্রথম উৎসব হয়। নদীয়া, ২৪ পরগনা এবং মুর্শিদাবাদের ৬ টি দল এই উৎসবে অংশ নেন। এরপর লোক সংস্কৃতির প্রেডিডেন্সি বিভাগের দুটি উৎসবে এবং রাজ্য উৎসবে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ মেদিনীপুর জেলার জেলা উৎসবে পুতুল নাচ প্রদর্শিত হয়। পুতুল নাচকে জনপ্রিয় করবার জন্য রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ তৎপর রয়েছেন।

ঐতিহ্যমণ্ডিত পুতুল নাচের বিকাশ ও প্রসারের ক্ষেত্রে বহুবিধ সমস্যা রয়েছে। তা অনুধাবন এবং সমাধানের উপায় উদ্ভাবনের জন্য প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে এই ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়। এর আগে বাংলার ছৌ নাচ এবং পট ও পটুয়াদের নিয়ে একটি করে ওয়ার্কশপ হয়ে গিয়েছে। পটের ওয়ার্কশপের ফলস্বরূপ রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ এই বৎসর নতুন দিল্লীতে আয়োজিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় পশ্চিমবঙ্গ মণ্ডপে বাংলার নকশী কাঁথা, বাংলার পটের প্রদর্শনীর জন্য 'ফোক আর্ট এ্যান্ড ক্র্যাফট্' শীর্ষক একটি সুদৃশ্য স্টল করার উদ্যোগ নিয়েছেন।

৩০ অক্টোবর শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের পদযাত্রা ও উৎসব পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে পুতুল নাচের ওয়ার্কশপ ও প্রদর্শনের সূচনা হয়। রাজ্য লোক সংস্কৃতি পর্ষদের সভাপতি শ্রীসুধী প্রধান পতাকা উত্তোলন করেন। লোক সংস্কৃতির প্রতি উৎসবেই পতাকা উত্তোলনের সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার সম্প্রতি গ্রহণ করেছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নদীয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি এবং জেলা লোক সংস্কৃতি পর্ষদের সভাপতি শ্রীপরিমল বাগচী সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক শ্রীসুধী প্রধান, প্রধান অতিথি নদীয়ার অতিরিক্ত জেলা শাসক শ্রীদেবব্রত ঘোষ, বিশেষ অতিথি জেলা শাসক শ্রীপ্রসন্নকুমার প্রধান, রাজ্য লোকসংস্কৃতি পর্ষদের সদস্য সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত উপ অধিকর্তা শ্রীমানিক সরকার ভাষণ দেন। শ্রীসরকার প্রতি বৎসর একটি নির্দিষ্ট সময়ে এক বা দুদিনের নিয়মিত ভাবে বগুলায় পুতুল নাচের উৎসব করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে স্থানীয় বিধায়ক ও অভ্যর্থনা সমিতির কার্যকরী সভাপতি শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বিশ্বাস, পুতুল নাট্য সংঘের সভাপতি শ্রীসুশান্ত হালদার, পুতুল নাচের প্রবীণ

শিল্পী ও বিশেষ অতিথি শ্রীনীলকান্ত চক্রবর্তী, শ্রীজিতেন হালদার, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক শ্রীনারায়ণ চন্দ্র বসু, অধ্যাপক শ্রীমুকুন্দ মুরারী বিশ্বাস প্রমুখ ছিলেন। সকল বক্তাই রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগকে অভিনন্দিত করেন।

এদিন বেলা ২টায় ওয়ার্কশপের উদ্বোধন হয়। শ্রীমানিক সরকার ওয়ার্কশপের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যায় মুর্শিদাবাদের ডাং পুতুল এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার লাঠি বা কাঠের পুতুল্ নাচের প্রদর্শনী হয়। প্রায় ২২জন বিশিষ্ট তথ্য সংগ্রহকারী কর্মশালায় তথ্য সংগ্রহ করেন। ৩১ অক্টোবর সকাল পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহের কাজ চলে।

৩১ অক্টোবর দুপুরে শ্রীসুধী প্রধানের সভাপতিত্বে মিলন সভা হয়। এই সভায় ও প্রদর্শনের নানা কাজে যুক্ত সকলেই যোগ দেন। দুদিনের ওয়ার্কশপে প্রাপ্ত তথ্যর ভিত্তিতে সংকলিত এবং সংক্ষিপ্ত লিখিত প্রতিবেদন পাঠ করেন শ্রীপুলকেন্দু সিংহ, শ্রীমুহম্মদ আয়ুব হোসেন, শ্রীঅলক সান্যাল, শ্রীমোহিত রায়, অধ্যাপক শ্রীঅকূলানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুশান্ত হালদার, শ্রীমতী মঞ্জু সরকার, শ্রীউৎপল ঝা, শ্রীমতী কৃষ্ণা ঘোষ, শ্রীরাধানাথ আদক, শ্রীঅনিল সাহা, শ্রীঅপূর্ব কর, শ্রীজয়ন্ত সরকার, শ্রীসুশীল সরকার, শ্রীঅবনী মোহন ভট্টাচার্য, শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, শ্রীকৃষ্ণধন টিকাদার প্রমুখ।

উপস্থিত প্রতিবেদনের উপর পুতুল নাচের শিল্পীদের পক্ষ থেকে শ্রীদুলাল বৈষ্ণব, শ্রীঅমরকৃষ্ণ দাস, শ্রীবদন বিশ্বাস, শ্রীবিমল কৃষ্ণ বিশ্বাস, শ্রীরামপদ ঘোড়ুই, শ্রীচন্দ্রশেখর ঘোষ, শ্রীশক্তিপদ প্রামাণিক প্রমুখ ভাষণ দেন। পুতুল নাচের অনুষ্ঠান এবং দলের যাতায়াত কালে যে সমস্ত বিঘ্নের সৃষ্টি হয় শিল্পীরা তার উল্লেখ করেন। কোন স্থানে অনুষ্ঠান করার অনুমতি দানের বিষয়টি সরলীকরনের প্রতি শিল্পীরা রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কেউ কেউ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মধ্যে পুতুল নাচের ব্যবসায়িক অনুষ্ঠান করার অনুমতি দানের বিষয়টি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, পৌর সভার চেয়ারম্যান অথবা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের জেলা অথবা মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের এক্তিয়ারভুক্ত করা যায় কিনা তা ভেবে দেখতে রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করেন।

বাংলার পুতুল নাচের অনুষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্য হয়ে আসছে। দলের সব দায় দায়িত্ব দলের প্রোপাইটারকে নিতে হয়। দলের মধ্যে বিভিন্ন স্তরের বা ভাগের কর্মী থাকেন—যেমন প্রোপাইটার, মাস্টার, নাচিয়ে, ম্যানেজার, বাদ্যকার। এঁরা সাধারণভাবে বেতনভোগী। বেতনের হার একপ্রকার নয়। লাভ-ক্ষতির জন্য দল ভাঙা-গড়া, বেচা-কেনা চলে। অনুষ্ঠান টিকিট করে হয়। পুতুল নাচের দল সাধারণভাবে পেশাদারী। বর্তমানে মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, সামগ্রিক আর্থিক সংকট ঐতিহ্যমণ্ডিত বাংলার পুতুল নাচকে প্রবল আঘাত দিয়ে চলেছে।

মিলন সভায় শ্রীসুধী প্রধান, শ্রীপরিমল বাগচী রাজ্য লোক সংস্কৃতি পর্ষদের সদস্য অধ্যাপক মানস মজুমদার তাঁদের ভাষণে পুতুল নাচের প্রসারে সাহায্য ও সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

সমাপ্তি ভাষণে শ্রীমানিক সরকার বলেন, প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে রচিত প্রতিবেদনে লোক-সংস্কৃতি পর্ষদের উত্থাপিত সুপারিশ পাওয়া গেলে রাজ্য সরকার নিশ্চয়ই বিবেচনা করবেন। লোক সংস্কৃতির বৈচিত্রময় পরিমন্ডলে পুতুল নাচের অবস্থানকে আরও উজ্জ্বল করার জন্য শিল্পীদের একত্রিত সংগঠিত হতে অনুরোধ করেন।

মিলন সভায় অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের হাতে অভিজ্ঞান পত্র তুলে দেন শ্রীসুধী প্রধান।

অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে পুতুল নাচের বিভিন্ন প্রকার পুতুলের একটি প্রদর্শনীও হয়।

(নিজস্ব প্রতিবেদক)



ভাষণরত দুঃস্থ পুতুল নাচের শিল্পী শ্রীনীলকান্ত চক্রবর্তী। মঞ্চে বাঁ দিক থেকে সর্বশ্রী মহম্মদ আয়ুব, সদস্য লোকসংস্কৃতি পরিষদ, সুধী প্রধান (উদ্বোধক) পরিমল বাগচী (নদিয়ার সভাধিপতি ও অনুষ্ঠানের সভাপতি) এবং জেলা শাসক।

সংস্কৃতি সংবাদ

শিলিগুড়িতে তথ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন

১ সেপ্টেম্বর ১৯৮১। সেদিনটা ছিল শিলিগুড়ি জনজীবনে বিশেষ অর্থবহ। তথ্যকেন্দ্র নির্মাণের প্রথম সূচনা হয়েছিল ঐদিন। নির্মাণ কার্য শেষ হয়েছে ৩১ মার্চ ১৯৮৭ তারিখে।

একটা করে ইট গাঁথা হয়েছে আর সংস্কৃতিপ্রাণ মানুষের স্বপ্নের পাপড়ি একটি একটি করে বিকশিত হয়েছে। তারপর একসময় সুবিশাল অট্টালিকা বিশাল এক রাজহাঁসের মতো বিস্তীর্ণ ডানা মেলে আকাশের বুকে মুখ তুললো। তথ্যকেন্দ্রের কাজ শেষ হলো। তার অভ্যন্তরে আছে ৮৭৬ আসনের এক বিরাট প্রেক্ষাগৃহ। এখানে চলচ্চিত্র এবং থিয়েটার দুয়ের ব্যবস্থা আছে। মঞ্চের জন্য প্রচুর আধুনিক আলো এবং নাটক মঞ্চায়নের জন্য অনেক থিয়েটারী আসবাবের ঢালাও ব্যবস্থা আছে। একতলায় আছে গ্রন্থাগার এবং একটি প্রদর্শনী কক্ষ। প্রদর্শনীর জন্য স্থায়ী প্যানেল এবং আলোর সুবন্দোবস্ত আছে। প্রেক্ষাগৃহটি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। বিদ্যুৎ বিভ্রাট এড়ানোর জন্য উপযুক্ত জেনারেটরের মোতায়েন আছে।

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে এমন বহুগুণ বিশিষ্ট তথ্যকেন্দ্র আর নেই। উত্তরবঙ্গের তথা পশ্চিমবঙ্গের এক গর্ব এই কেন্দ্র।

দীর্ঘ ছ' বছর অপেক্ষা করেছেন শিলিগুড়ির মানুষ একটি শুভক্ষণের জন্য। দিন গুনতে গুনতে অপেক্ষার দিন একদিন শেষ হলো। সময়ের স্টীমার একদিন নির্দিষ্ট দিনের ঘাটে এসে ভিড়লো। ১ নভেম্বর ১৯৮৭।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু ১ নভেম্বর ১৯৮৭ তারিখে ঐ তথ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন। সারা উত্তরবঙ্গে সেদিন ছিল এক শিহরণ। অসংখ্য মানুষ ভিড় করেছিল অনেক আশা আর বিপুল উদ্দীপনা নিয়ে। প্রদর্শনী কক্ষে ছিল 'প্রগতির এক দশক' শীর্ষক এক পট-আলেখ্য। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করলেন তথ্য ও সংস্কৃতি এবং পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। প্রধান অতিথি ছিলেন পার্বত্য উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীতামাং দাওয়া লামা। উপস্থিত ছিলেন খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীনির্মলকুমার বসু।

প্রেক্ষাগৃহের দ্বার ছিল উন্মুক্ত। চার দেওয়ালের ভিতরে কি আছে দেখবার জন্য উৎসুক মানুষের ভিড়। দেওয়াল ছুঁয়ে, বসবার আসন ছুঁয়ে মানুষ আদর করলো তাদের কাঙ্ক্ষিত বস্তুকে। ভেতরের অপূর্ব অলংকরণ দেখে একজন বললেন—এ কোথায় আছি, শিলিগুড়িতে না কোলকাতায়।

মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রের নির্মাণ সৌষ্ঠব দেখে ভূয়সী প্রশংসা করলেন। ভাঙনের নয়, গড়ার জীবনই কাম্য। সেই পথেই আমাদের পদক্ষেপ। সংস্কৃতির জয়যাত্রা পরিপূর্ণ জীবনের প্রতিবিম্ব। সার্বিক ঐক্যই আমাদের ঐকান্তিক লক্ষ্য।

কেন্দ্রটির সুঠাম পরিচালন ব্যবস্থা শীঘ্রই গড়ে উঠবে। কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

নভেম্বরের প্রথম তিনটি দিন শিলিগুড়ি ছিল উৎসব মুখর তিনদিনে নিটোল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শিলিগুড়ির মানুষকে খুশি করেছে। উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলা থেকে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদা—শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। অতি উচ্চমানের নৃত্য, গীত, আবৃত্তি ও নাটক এবং অতি মনোরম অলংকরণ সামগ্রিকভাবে অনুষ্ঠানকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলেছিল।

—অজিত শাসমল

প্রখ্যাত জনপ্রিয় গায়ক শ্যামল মিত্রর জীবনাবসান

বেশ কয়েক বছর আগে এক মারাত্মক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হবার পর সুস্থ হয়ে উঠে যিনি দরদী গলায় গেয়েছিলেন—তোমাদের ভালোবাসা মরণের পার হতে ফিরায়ে এনেছে মোরে—সেই প্রখ্যাত গায়ক শ্যামল মিত্র আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। ১৫ নভেম্বর রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ এক নার্সিংহোমে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী, দুই পুত্র ও এক কন্যা। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯। অন্তিম মুহূর্তে তাঁর পাশে ছিলেন শ্রীসতীনাথ মুখার্জি, শ্রীমতীউৎপলা সেন, শ্রীহৈমন্তী শুক্লা।



শ্যামল মিত্র

অন্ত্র থেকে রক্তক্ষরণের দরুন মিত্রকে ৫ নভেম্বর হ্যারিংটন নার্সিং হোমে ভর্তি করা হয়। রবিবার রাতে হঠাৎ হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে পড়ায় তাঁর জীবনাবসান ঘটে। মৃত্যুর খবর পাওয়ার সংগে সংগে তাঁর অসংখ্য সংগীতানুরাগীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী, সুরকার, অভিনেতা ও সাধারণ মানুষ নার্সিংহোমে ভীড় জমান।

শ্যামল মিত্রের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তিনি শিল্পীর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। রাজ্যের ক্রীড়া, যুবকল্যাণ ও পর্যটন দপ্তরে মন্ত্রী শ্রীসুভাষ চক্রবর্তীও শ্যামল মিত্রের জীবনাবসানে শোকপ্রকাশ করেছেন।

গত চারদশক ধরে জনপ্রিয় গায়ক শ্যামল মিত্র তাঁর অমল কণ্ঠমাধুর্যে বাংলার মানুষজনকে আপ্লুত করে রেখেছিলেন। গায়ক হিসেবে যেমন মানুষের মনে দোলা দিয়েছিলেন তেমনি সুরকাররূপে বৈচিত্র্যের সন্ধান দিয়েছেন বাংলা গানে। ছায়াছবির গানেও তিনি তারিফ কুড়িয়েছেন। বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্রে তিনি সংগীত পরিচালনাও করেছেন। এর মধ্যে আছে 'দেয়ানেয়া', 'সাগরিকা', 'বনপলাশীর পদাবলী', 'জি টি রোড', 'অমানুষ', 'আনন্দ আশ্রম।' 'সাড়ে চুয়াত্তর' ছবিতে একটি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। ঋত্বিক ঘটকের 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' ছবিতে গেয়েছিলেন 'অনেক ঘুরিয়া শেষে আইলাম রে কলকাতায়।'

সংক্ষিপ্ত জীবনী : কলকাতায় আসার আগে তাঁর জীবন কেটেছে নৈহাটিতে। গংগা পেরিয়ে হুগলি মহসীন কলেজে পড়াশোনা করেছেন। ফুটবলেও বেশ নামডাক ছিল। তাঁর বাবা ছিলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক। নৈহাটিতে গণনাট্য সঙ্ঘের শাখা গড়ার পিছনে তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল। সে সময়টা ১৯৪৪-৪৫ সাল। বিশিষ্ট সুরকার শ্রীসলিল চৌধুরীর কাছে তখন গণসংগীত শিখেছিলেন। উচ্চাংগ সংগীতেরও রেওয়াজ বেশ নিষ্ঠার সংগেই করেছিলেন। সুধীরলাল চক্রবর্তীকে তাঁর গানের গুরু বলা হয়। সে সময় তাঁর সংগে শ্রমতীউৎপলা সেনও সুধীরলালের কাছে গান শিখতেন।

ব্রতচারী শুভকেন্দ্রের শিক্ষাশ্রেণী সারাদিনের শিবির

৭ অক্টোবর ১৯৮৭ থেকে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত 'সংক্ষিপ্ত' ও 'মাধ্যমিক' পর্যায়ে শিক্ষাশ্রেণীর মধ্যেই ১৮ অক্টোবর দক্ষিণ চন্দননগর তেমাথা ঊষাঙ্গিনী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে চন্দননগর ব্রতচারী শুভকেন্দ্র "সারাদিনের শিবির" পালন করে। পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ-এর অনুমোদন প্রাপ্ত 'ব্রতচারী শিক্ষাশ্রেণীর' পরিচালনায় ছিল বাংলার ব্রতচারী সমিতি। শিক্ষাশ্রেণী ও সারাদিনের শিবিরে কোন্নগর, শ্রীরামপুর, চুঁচুড়া, মগরা, দেবীপুর, পাণ্ডুয়া, মেমারী প্রভৃতি অঞ্চলের প্রায় ১২৫ জন অংশ নিয়ে বিভিন্ন ব্রতচারী নৃত্যালী, গীতালি, কৃত্যালি, ব্যায়মালি, ফৌজালি, কর্মশিক্ষা (বই বাঁধাই ও রুটি সেঁকা যন্ত্র), ড্রিল, যোগাসন, ছোট খেলা (কাবাডি, খো-খো), ছড়ার ব্যায়াম শিক্ষা নেয়।

১৮ অক্টোবর স্বাগত গান দিয়ে সারাদিনের শিবিরের সূচনা। শ্রী রমেশ কুমার তেওয়ারী নির্দিষ্ট সময় সকাল ৮টায় চন্দননগর ব্রতচারী শুভকেন্দ্রের শিবির উদ্বোধন করে বলেন, শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থীনীরা খেলাধুলার মাধ্যমে সময় ও নিয়মানুবর্তিতার সাথে যেভাবে নিজেদের গঠন করছেন, ঠিক সেইভাবে তাঁরা যেন অপরকেও গড়ে তোলেন। ব্রতচারী শিক্ষার মূল লক্ষ্য জাতপাত, ভেদাভেদহীন সুন্দর সমাজগঠন, ভ্রাতৃত্ব, একতা ও জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটানো। বর্তমান অবক্ষয়ী সমাজ-এ ব্রতচারী আদর্শের অবশ্যই দরকার আছে। প্রাত:কালীন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি চন্দননগর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায় গঠনমূলক ভাষণে ব্রতচারীর নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে শরীর, চরিত্র ও দেশগঠনের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ব্রতচারীর একটাই সুর—আমরা সবাই অভিন্ন। আজকের একদিনের বা পনের দিনের শিক্ষাশ্রেণী শেষ নয়। নিয়মিত অনুশীলনের সাথে সাথে একে আরো ছড়াতে হবে। ছোট ছোট শিবির করে সর্বত্র ব্রতচারীর মহৎ উদ্দেশ্যের কথা জনসাধারণের মনে গেঁথে দিতে হবে। তিনি ব্রতচারীকে 'লোকশিক্ষার প্রতীক' বলে বর্ণনা করেন। ব্রতচারী প্রবর্তক গুরুসদয় দত্ত ও তাঁর হাতে গড়া ছাত্র ব্রতচারী শুভকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা বলাইকৃষ্ণ গোলের প্রতিকৃতিদ্বয়ে মালা দেন যথাক্রমে উপ-মহানাগরিক ও মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক। অন্যতম শিক্ষণ সচিব সমীরকুমার দাস শ্রীযুক্ত তেওয়ারী ও শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দেন।

বিকেলে "শারদ মিলনোৎসব" উপলক্ষে শিক্ষার্থী, সভ্য ও নায়কগণ উপহার দিলেন একরাশ ছড়ার ব্যায়াম, বহুবিধ ক্রীড়া কসরৎ (ডবল ডন, চড়ক বড় ও ছোট চাকা, বৈঠক, কুমির ডন, হাতি) ও ব্রতচারী নৃত্যালি অভিপ্রদর্শনী। বৈকালীন অনুষ্ঠানের সভানেত্রী ঊষাঙ্গিনী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা জয়শ্রী চক্রবর্তী অংশগ্রহণকারীদের চরিত্র ও স্বাস্থ্য সঠিকপথে গঠনের কামনা করে, উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, চারিদিকে প্রচুর সমস্যা, খেলাধুলা অভ্যাস, অনুশীলনের মাঠ-ময়দানের অভাব তথাপি শরীর-স্বাস্থ্যের জন্য এরকম শিবির প্রচলিত রাখতে হবে। এরকম সাময়িক শেখা কিছুই নয়। প্রধান ও বিশেষ অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ডক্টর কমলাক্ষ ভট্টাচার্য, চিকিৎসক মধুসূদন দত্ত ও শিক্ষিকা ইলা মুখোপাধ্যায়।

অভিপ্রদর্শনীর মূল আকর্ষণ ছিল অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়-এর ঢোলের তালের সাথে সাথে গোবিন্দ আইচের নেতৃত্বে নিজস্ব বীররসাত্মক রণনৃত্যান্বয় রায়বেশে ও ঢালি। এছাড়া সারি, জারি, রাস, বাউল। আমরা বাঙালী, আমরা মানুষ দল, ধামাইল নৃত্যও অনুষ্ঠিত হয়। নেতৃত্ব দেন সর্বমঙ্গলা ঘোষ। ঢালি সৈনিকদের ঢাল ও তলোয়ার সমেত যুদ্ধ দর্শক সাধারণের প্রচুর প্রশংসা পায়। সবার প্রিয় ও বলাইজী গুরুজী আরাবের পর সারাদিনের শিবির সমাপ্ত হয়। পূজাবকাশকালীন পনের দিন শিক্ষাশ্রেণী অন্তে পরীক্ষার পর অভিজ্ঞান পত্র দেবেন বাংলার ব্রতচারী সমিতি।

চিঠিপত্রে জনমত

"যুব মানসে বিদ্যাসাগর"

মহাশয়,

আপনাদের পশ্চিমবঙ্গ নামক সাপ্তাহিক মুখপত্রে (বর্ষ ২১, সংখ্যা ১২-১৩, ১৮-২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭) "যুব মানসে বিদ্যাসাগর" শীর্ষক লেখাটি পড়ে আনন্দিত হলাম। শ্রদ্ধেয় নারায়ণ বসুকে ধন্যবাদ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সৃজনশীল দিকগুলির প্রতি তিনি মূল্যবান দৃষ্টি দিয়েছেন। আমাদের মধ্যে অনেকেই বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানেন না। এটা ভাবতে অত্যন্ত দু:খ লাগে। লেখাটি পড়ার পর, আমার তাঁর সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য জানা হয়ে গেল।

আজ আমাদের বিশেষ করে যুবক যুবতীদের, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আদর্শে নতুন দেশ গড়ার দিকে এগিয়ে যেতে হবে। তাতে অনেক বাধা হয়ত আসতে পারে—কিন্তু বিচলিত হলে চলবে না, কারণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনে কোটি কোটি বাধা এলেও তিনি সগর্বে সেগুলিকে উৎখাত করেন। নারী জাতির প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্রদ্ধা ছিল প্রশ্নাতীত। আজ দেশের বিভিন্ন অংশে ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে দেশকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। ধর্মের নামে নারী হত্যা চলছে। নগ্নভাবে সম্প্রতি রাজস্থানে ধর্মের নামে যে জঘন্য 'সতীদাহ' প্রথা ঘটে গেল তাতে প্রমাণ হয় হিন্দু মৌলবাদ তার কালো হাতকে প্রসারিত করার চক্রান্তে লিপ্ত। চোখ বুজে বলে দেওয়া যায় রাজীব গান্ধীর তোষণনীতি বিচ্ছিন্নতাবাদী ও ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তিদের উৎসাহিত করছে। রাজীব গান্ধীর সংকীর্ণ ভোটের রাজনীতি দেশ জুড়ে মানুষে মানুষে বিভেদ বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করছে। আজ বিদ্যাসাগর মহাশয় বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই এর নিন্দা করতেন, তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতেন এর বিরুদ্ধে।

রাজীব গান্ধীর তোষণনীতির ভাগীদার 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ', 'শিবসেনা', 'জামাতী ইসলামী', 'মুসলীম লীগ' প্রভৃতি ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী দলকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

এই সব দলই বিদ্যাসাগরের আদর্শকে কলঙ্কিত করতে চায়, নারীদেরকে পণ্যে পরিণত করতে চায়। সুতরাং এটা সহজেই অনুমেয় বিদ্যাসাগরের প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখাতে গেলে সর্বাগ্রে এই সব বিভেদকামী নারী-স্বার্থ-বিরোধী দলকে যেমন একঘরে করে নিষিদ্ধ করে দিতে হবে, সেই সঙ্গে তাঁর আদর্শকে আরও বেশী করে তামাম জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকারের যথেষ্ট ভূমিকা আছে বলে আমি মনে করি।

তাঁরা বিভিন্ন প্রকার ভূমিকা নিতে পারেন, বিদ্যাসাগরের আদর্শ বিভিন্ন ভাষায় প্রচার করে।

জাতীয় সংহতি এবং ঐক্যকে সবল করতে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উৎখাত করতে বিদ্যাসাগরের আদর্শে জনগণকে নেতৃত্ব দিতে হবে। মনে রাখতে হবে আগে দেশ, তারপর দলীয় রাজনীতি।

ইতি
জয়কুমার দে
বনপাশ, বর্ধমান

আকাশবাণীর সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন ১৯৪৭ সাল থেকে।

বাংলা ফিল্মে তাঁর প্রথম প্লেব্যাক 'সুনন্দার বিয়ে' ছবিতে। সেটা ১৯৪৮ সাল। প্রথম সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নেন 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ' ছবিতে। চারটি চলচ্চিত্রও প্রযোজনা করেছেন–দেয়ানেয়া, আমি সে ও সখা, খেয়া ও রাজকন্যা। এছাড়া মিউজিক ডিরেক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন। জীবনের শেষ গানের রেকর্ড পুত্র সৈকতের সঙ্গে। শিল্পীর জীবন বাঁচাতে অসংখ্য মানুষ রক্ত দিতে এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের কাছে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন অনুজ শ্রীসলিল মিত্র।

তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে ও শোকার্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক-শিল্পী সঙ্ঘের রাজ্য কমিটি এবং ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি। গণনাট্য সঙ্ঘের তরফে বলা হয়েছে, প্রয়াত শিল্পী একদা গণনাট্য আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। গণতান্ত্রিক লেখক-শিল্পী সঙ্ঘ বলেছেন, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে আধুনিক বাংলা গানকে যে শিল্পীরা জনপ্রিয়তার শীর্ষে নিয়ে গিয়েছিলেন শ্যামল মিত্র ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাঁর জীবনাবসান বাংলা সংগীতের জগতে এক বিরাট ক্ষতি। খরা, দুর্গত আফ্রিকার সাহায্যার্থে ক্যাসেটেও তাঁর গান আছে।

তাঁর অনেক গানের কলি কয়েক দশক ধরে মানুষের মুখে মুখে ফিরছে। যিনি গানে ভুবন ভরিয়েছিলেন, যিনি অগণিত গুণগ্রাহীর ভালোবাসায় একসময় মরণের পার থেকে ফিরে এসেছিলেন সেই শিল্পীর সমাধি এখন থেকে ফুলে ফুলে ঢাকা থাকবে।



আসানসোল পৌরপতির হাত থেকে আর্থিক অনুদান গ্রহণ করছেন একজন দুঃস্থ শিল্পী

শিল্পীদের আর্থিক অনুদান প্রদান

গত ৭ নভেম্বর ১৯৮৭ আসানসোল পূর্বরেলের নজরুল মঞ্চে লোকশিল্পীদের দ্বারা একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন মহকুমা শাসক শ্রীদিলীপকুমার দাস। প্রধান অতিথি হিসাবে অনুদান প্রধান করেন পৌরপতি শ্রীগৌতম রায়চৌধুরী। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক। সীমিত আর্থিক ক্ষমতা সত্ত্বেও লোকশিল্পীদের সাহায্যার্থে সরকারি ব্যবস্থাপনার উল্লেখ কোরে বক্তব্য রাখেন শ্রীরামশংকর চৌধুরী, সদস্য পঃ বঃ লোকসংস্কৃতি পর্ষদ। এ জাতীয় অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেন শ্রীবিজয় পাল। লোকশিল্পীরা ভাদুগান, ছাঁদ পেটানোর গান, মনসার গান, কাঠি নাচ, গোড়া নাচ ও সাঁওতালী নাচ পরিবেশন করেন। প্রচুর দর্শক উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠান দেখেন। ৪টি লোক সংস্থা ও ৮ জন লোকশিল্পীকে মোট ৪,১৩৩.৩৫ আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়।



আসানসোলের নজরুল মঞ্চে সাঁওতালী শিল্পীরা (বার্ণপুর রাঙাপাড়া) নৃত্য পরিবেশণ করছেন।

দুঃস্থ শিল্পীদের অনুদান প্রদান

কালনা মহকুমা তথ্য আধিকারিক জেলা লোক শিল্পী পর্ষদের অনুমোদন ক্রমে কালনা মহকুমার অন্তর্গত শ্রীভক্ত ভাস্কর, শ্রী নিশাকর দে ও শ্রীভূরি দে-কে মোট ১০৫০ টাকা দুঃস্থ-শিল্পী-অনুদান হিসাবে প্রদান করেন।

পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে দুঃস্থ শিল্পীর জীবন ও জীবিকার মান উন্নয়নের জন্য এই আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়।

মিলন তীর্থের যাত্রা-উৎসব

গত ২৪।১০।৮৭ ঘাসগড় মিলন তীর্থের পরিচালনায় শ্রীমহাদেব হালদার রচিত "ভিখারিনী মা" যাত্রা পালাটি মঞ্চস্থ হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি।

পুস্তক পরিচয়

জলে জঙ্গলে জীবনে—রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

নবচেতনা: শিবপুর, মূল্য—পনের টাকা। প্রথম প্রকাশ: শ্রী পঞ্চমী, ১৩৯৩।

নাট্যকার রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নয়টি গল্প এবং একটি সিনেমা তৈরির-গল্প-এর সংকলন গ্রন্থ। কাক-কোকিল, পেঁচা-কাকাতুয়া, বাঘ-কুমির, একটি হাতির গল্প, বুধন ও মদন শিশু মনোরঞ্জনের গল্প। রমেনবাবু গল্প বলতে জানেন। পাখীপশুদের নিয়ে গল্প লিখলেও সেগুলির মধ্যে এমন একটি মানবিক আবেদন আছে যা সকলেরই ভাল লাগবে। কাকের বাসায় কোকিল ডিম পাড়ে একথা বহু পুরানো কিন্তু তাকে নিয়ে এমন গল্প করা যায় তা না পড়লে ভাবা যাবে না। বিষয়বস্তুর নতুনত্ব নেই, কিন্তু পরিবেশনে মুন্সীয়ানা আছে। অন্য গল্পগুলোর সম্পর্কেও একই উক্তি প্রযোজ্য। তা ছাড়া গল্পগুলো শিশুদের জন্য হলেও এতে কোনো আজগুবি ব্যাপার নেই। একটা যুক্তিসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক মনই ক্রিয়াশীল।

বাঘ-ভাল্লুক, কুমীর হাতি, নিয়ে গল্প বলার রেওয়াজ বহুদিনের। এখানে সেইগুলির মধ্যে একটা আধুনিক মনের পরিচয় আছে। সুন্দরবনে বাঘ কুমীরের লড়াই এবং একটি হাতির গল্পে সখের শিকারী এবং সুবিধেবাদী ঝোঁক সম্পর্কে ব্যাঙ্গ করা হয়েছে। গল্প দুইটি সত্যি ভাল হয়েছে। ক্রুদ্ধ যুবকের নেতৃত্বের লোভে হঠাৎ কিছু করার প্রবণতাকে দলছাড়া হাতির অপরিণামদর্শিতার সঙ্গে চমৎকার তুলনা করা হয়েছে। বুধন ও মদন একটি ভালুকের গল্প। ভালবাসার বাঁধনের গল্প। বুধন তার পোষা ভালুকের নাম দিয়েছে মদন। এক সময়ে বুধন ভালুকটিকে বনে ছেড়ে দিয়েছিল কিন্তু আশ্চর্য মদন শেষ পর্যন্ত বন থেকে ফিরে এল বুধনের কাছে।

এ ছাড়াও রমেনবাবু লিখেছেন 'একটি বুর্জোয়া অপরাধ', 'একটি লিটোল বুর্জোয়া গল্প', 'একটি বৈজ্ঞানিক গল্প' প্রভৃতি। বুর্জোয়া অপরাধের মধ্যে আছে একটি কিশোরকে জোর করে তুলে নিয়ে মুক্তিপণ আদায়ের গল্প। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এই ধরনের অপরাধ বেশি দেখা যায় বলেই লেখক এই নামকরণ করেছেন। কিন্তু একটি লিটোল বুর্জোয়া গল্প বলতে গিয়ে লেখক রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের সব গল্পকেই বুর্জোয়া গল্প বলেছেন। এটা কি ঠিক? বুর্জোয়া গল্প বলতে আমরা কি বুঝব? বুর্জোয়া সমাজকে নিয়ে যে গল্প? তাহলে মুকুট, দেনাপাওনা, রামকানাইয়ের নিবুর্দ্ধিতা, নিশীথে, সুভা প্রভৃতি গল্পকে কি বলা যায়? তিনি যে গল্প বলেছেন সেটাও এক রোমান্টিক গল্প। একজন বড় দরের ইঞ্জিনীয়ার শেষ পর্যন্ত ছোটনাগপুরের অঞ্চলে ওঁরাও সমাজের এক মেয়ে ক্যাথারিনার সঙ্গে থেকে গেল। বুর্জোয়াদের মধ্যে কি এই ভাববিলাস সম্ভব?

এইসব গল্পের সঙ্গে লেখক একটি সিনেমা তৈরির গল্পও উপহার দিয়েছেন। কি করে সিনেমা তৈরি করতে হয় তাঁরই বর্ণনা।

গ্রন্থটি লেখক নিজেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থ প্রকাশে লেখকের অসুবিধার কথা জানিয়েছেন। তাতে প্রকাশের পরিপাট্যের কোনো উৎকর্ষ ঘটেনি। এই গ্রন্থের মধ্যে লেখক অনেক কথাই বলতে চেয়েছেন কিন্তু সেগুলোকে একটা রসরূপ বা শিল্পসম্মত রূপ দেওয়ারও দায়িত্ব লেখকের থাকে। সেদিকে আরো যত্নবান হলে ভালো হতো।

ডিরোজিও—রবিদাস সাহা রায়।

পাইওনীয়ার পাবলিশার্স। ২০৬ বিধান সরণি, রুম নং ১৭, কলিকাতা—৭০০০০৬। দ্বিতীয় সংস্করণ, ৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭। মূল্য বারো টাকা।

স্বল্পজীবি ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) বয়োধর্মে নয়, প্রাণধর্মেই বাংলার নবযুগের অন্যতম প্রাণ পুরুষ। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, "ডিরোজিও বাঙালী যুব সমাজের মধ্যে আধুনিক পাশ্চাত্য ভাবধারার বীজ বপন করেন। স্বাধীনতার প্রতি আকাঙ্ক্ষা ও দেশপ্রেমের মনোভাব ছাত্রদের মনে জাগিয়ে তুলবার এক দুর্লভ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন ডিরোজিও। তিনি অনেক দেশাত্মবোধক কবিতা লেখেন। ডিরোজিও এবং তাঁর ছাত্র কাশীপ্রসাদ ঘোষের আগে ভারতবর্ষে অন্য কেউ দেশাত্মবোধক কবিতা লিখছেন বলে জানি না।"

এ দেশের মাটিতেই ডিরোজিওর জন্ম। এ দেশে প্রচলিত কু-আচার এবং কু-নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমি আমার দেশকে ভালবাসি এবং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা আমর কাম্য।" হিন্দু কলেজকে কেন্দ্র করে তিনি যে দেশপ্রেম এবং সংস্কার মুক্ত মনের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন কায়েমী ধর্মান্ধ গোঁড়া হিন্দু সমাজ তা সহ্য করতে পারলেন না। তাকে চাকরি থেকে বিতাড়িত করল। তবুও প্রকৃত জ্ঞানী এবং শিক্ষক ডিরোজিও তাঁর আদর্শ থেকে সরে দাঁড়ান নি। মানুষের মনের ভেতর চিন্তা-বিপ্লবকে জাগিয়ে তুলতেই হবে। সেই সময়টা ছিল রামমোহনের যুগ। রামমোহনকেও এই গোঁড়া সমাজের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছিল। ডিরোজিও সতীদাহের বিরুদ্ধে, ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে কবিতা লিখেছিলেন। এই বিদ্রোহী এবং প্রকৃত শিক্ষককে সহ্য করা যায় না। অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোর জন্য সংগ্রাম করা ছিল খুবই শক্ত। রামমোহন, ডিরোজিও-বিদ্যাসাগর সেই শক্ত কাজই করে গিয়েছেন আদর্শের খাতিরে।

যারা মহৎ আদর্শের জন্য সংগ্রাম করে, জীবন উৎসর্গ করে ইতিহাস তাদের ভোলে না। ডিরোজিওর মৃত্যুর দেড়শ বছর পূর্তি উপলক্ষে তাঁর জীবন ও কীর্তি সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়েছে। ডিরোজিওর মহৎ আদর্শের স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার জন্য তাঁর সম্পর্কে নতুন নতুন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কলকাতায় ডিরোজিওর নামে রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে, সরকারি হলের নামকরণ করা হয়েছে।

রবিদাস সাহা রায় বিদ্রোহী ডিরোজিও-র জীবন ও কৃতিকে সংক্ষেপে কিশোরদের কাছে উপস্থিত করে বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরেছেন। তার সেই কাজ সফল হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ভবিষ্যৎ জীবন দৃষ্টি গড়ে তোলবার জন্য অতীতের মহান আদর্শ এবং সেই আদর্শের জন্য যারা সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন তাদের কাহিনী জানা একান্ত আবশ্যক। সেদিক থেকে গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। এই সংস্করণেও দু একটি ত্রুটি আছে। রামমোহনের জন্ম সালটি ভুল লিখিত হয়েছে। ভূমিকায় স্ব-বিরোধী বক্তব্য আছে। প্রথমে বলেছেন, কলকাতায় ডিরোজিওর নামের কোনো রাস্তা নেই, পরে নিজেই বলেছেন পুরসভা রাস্তার নামকরণ করেছেন। এগুলো না থাকলেই ভালো হতো।

সমাজ উন্নয়ন ও পরিবর্তনের নীতিকথা—সুকুমার সিং

প্রকাশক—মাস এডুকেশন, ১৪/১, টাউনসেন্ড রোড, কলিকাতা-২৫। মূল্য পাঁচ টাকা।

সমাজস্থ মানুষ হিসেবেই সমাজ কল্যাণ ও উন্নয়নের ভাবনা সভ্যতার প্রায় ঊষালগ্ন থেকেই চলে আসছে। পরস্পরকে বিপদে আপদে সাহায্য করা মানবিকতার একটি প্রধান শর্ত। তবে সমাজের গতি যেমন স্থির নয় তেমনি এই কল্যাণ ও উন্নয়ন বিষয়ক ভাবনাও সমাজের তালে তালে পরিবর্তন ও উন্নত হয়েছে। আধুনিক সমাজে সমাজ কল্যাণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান রূপে পরিণত হয়েছে।

আলোচ্য গ্রন্থে সমাজ কল্যাণের সংজ্ঞা থেকে শুরু করে যুগে যুগে সমাজ কল্যাণ, প্রাক শিল্প যুগে সমাজ কল্যাণ, যুগে যুগে ভারতে সমাজ কল্যাণ, সমাজ কল্যাণের বিবর্তনে ধর্মের স্থান, ভারতে সামাজিক আইন, ভারতে সমাজ কল্যাণ ও সংস্কার আন্দোলন, ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিহাস, আধুনিক ভারতে শিক্ষা, সাহায্য বা দান একটি নয়া উপনিবেশবাদী কৌশল, অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির ভূমিকা, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাউন্সিল ও আচরণ বিধি, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মৌলিক সমস্যা আলোচিত হয়েছে। দানশীলতা ভারতবর্ষের একটি প্রচলিত ব্যবস্থা ছিল। ঠিক একভাবে না হলেও পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও অসহায়দের সাহায্য করার নানা প্রবণতা ছিল। আধুনিক যুগে সমাজ সেবাকে নানাভাবে এমনকি আইনের সাহায্যেও সুসংগঠিত করার প্রচেষ্টা চলেছে।

অতীত থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত সমাজ কল্যাণের জন্য যে কাজ হয়েছে, যে আন্দোলন হয়েছে, যে যে আইন প্রণীত হয়েছে বিশেষ করে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। শিক্ষাও সমাজ কল্যাণের অংগ। সেজন্য লেখক সংক্ষেপে ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থার এমন কি রাজীব গান্ধীর শূন্যগর্ভ নয়া শিক্ষানীতিরও আলোচনা করেছেন। সমাজকল্যাণের নামে বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদী এবং নয়া উপনিবেশবাদী কৌশলও পরিলক্ষিত হয়েছে। খাদ্য সাহায্যের নামে মার্কিনী পি. এল. এর কথা আমাদের স্মরণে আছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে লেখক আলোচ্য পুস্তকটির মধ্যে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির দায়িত্ব ও সমস্যার কথা আলোচনা করেছেন। সংক্ষেপে সমাজ উন্নয়ন সম্পর্কে লেখক একটি সার্বিক চিত্র এই পুস্তকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। সমাজ কল্যাণ মানুষদের পক্ষে সমাজ কল্যাণ সম্পর্কে একটি সামগ্রিক চিত্র এই পুস্তকে পরিবেশন করা হয়েছে। উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে সাধু।

সরোজমোহন মিত্র

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের আলোকে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ কৃষ্ণকলি বিশ্বাস। ফার্মা কে.এল.এম প্রাঃ লিঃ। কলকাতা-১২। মূল্য–১৫ টাকা

মনীষার ঔজ্জ্বল্য ও স্বাতন্ত্র্যের নিরীখে প্রকৃত ডিরোজিয়ানদের অন্যতম হলেন রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেড়শো বছর পূর্বে বাংলা ভাষার শৈশবকালে বিশ্ববিদ্যাকোষ রচনার দুঃসাহস প্রকৃত ডিরোজিয়ানরূপে কৃষ্ণমোহনই দেখিয়েছিলেন।

বাংলায় উনিশ শতকের নবজাগরণ সাথক না ব্যর্থ, পরিপূর্ণ না আংশিক–এ নিয়ে বুধমন্ডলীর মধ্যে আজো বিতর্কের অবসান ঘটেনি–মনে হয় ঘটা সম্ভব নয়। কিন্তু এই নবজাগরণের উষালগ্নে উৎক্ষেপ-উৎকণ্ঠা-উদ্বেগের প্রতিভাস স্বরূপ সৃষ্ট যে মহামূল্যবান সারস্বত-অবদান, তারই নিরীখে এই যুগের এবং যুগব্যক্তিত্বের বিচার বিশ্লেষণের দ্বারাই মনে হয় উনিশ শতকের যুগলক্ষণ চিহ্নিত করা যাবে।

শ্রীমতী কৃষ্ণকলি বিশ্বাস সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে সমসাময়িককালের ঘটনার বিচার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণমোহনের জীবনের যে রেখাচিত্র উপহার দিয়েছেন তা শুধু গবেষকদেরই নয় অনুসন্ধিৎসু সকল শ্রেণীর-পাঠক পাঠিকাদের কাছেই আকর্ষণীয় হবে বলে মনে হয়। বিশ শতকের সমাপ্তি-পর্বে আজো ভারতের বুকে সতীদাহের মতো জঘন্য ঘৃণ্য ঘটনা যখন কোনো কোনো মহলে উৎসাহ ও উল্লাসের বীভৎসতা সৃষ্টি করছে, তখনি বহু স্ববিরোধিতা ও সীমাবদ্ধতার মধ্যেও 'সত্যের বন্ধু ও মিথ্যার শত্রু' এই ধ্রুব আদর্শের সার্থক রূপায়ণকারী অগ্রনায়ক কৃষ্ণমোহনদের কর্মজ্ঞানপ্রয়াসের বিচার বিশ্লেষণ ও মনন আমাদের অনেককেই বোধহয় পথ চিনে নিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এবং সেই কারণেই এ জাতীয় গ্রন্থের বহুলপ্রচার কাম্য।

কবিতা ! কবিতা !!

পশ্চিমবাংলার আকাশে-বাতাসে, জলে-স্থলে, খেতে-খামারে, কলে-কারখানায়, পথে-ঘাটে কবিতা ছড়িয়ে আছে। নদী-মাতৃক দেশের মানুষের দেহে-মনে কবিতার অজস্র আলপনা।

সংগ্রামী মানুষের হাতে উৎসর্গীকৃত প্রণতি ঘোষের 'ঘাসের মঞ্জরী' কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাংলা আকাদেমির আর্থিক আনুকূল্যে। সংকলনের ৩৭টি কবিতার মধ্যে বেশ কয়েকটিতে চলমান মানুষের সংগ্রামী জীবনের প্রত্যক্ষকল্প স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়েছে। 'মিছিল', 'মোলইজ', 'তুমি অর্জুন', 'সার্থক জনম', 'বন্দর অনেক দূরে' প্রভৃতি কবিতাগুলি সত্যিই মনে রাখবার মতো।

শ্রীমতী তৃপ্তি ব্রহ্মের 'মুখর ভালবাসা' কবিতা সংকলনটি কবির কাব্যগ্রন্থ 'ভালবাসার মুখ'-এর (প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫) সংযোজিত নতুন সংস্করণ। শ্রদ্ধার সংগে প্রবীণ কবি শুদ্ধসত্ত্ব বসুকে উৎসর্গীকৃত এই গ্রন্থে ৪৮টি কবিতা নানান স্বাদের আস্বাদনে তৃপ্ত করবে পাঠক পাঠিকাদের। 'ফসলের ঘ্রাণ' কবিতায় সাহসী রূপকল্পের সার্থক প্রয়োগে আপাতভাবে দেহবাদী কবিতা দেহাতীত ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে। কবির ভাষায় "আকাল, পৃথিবী, মানুষ সহ মন ও মনন দিয়ে শুরু করে বাংলার বাউলের দেহ থেকে দেহাতীতে উত্তরণের পালা"র বিচিত্র প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষ করি। বেশ কয়েকটি কবিতা মনে রাখার মতো–যেমন "শঙ্খমালা মেয়ে", "আত্মজা" "মৌনমুখর", "এখানে বনভূমি", "মুখর ভালবাসা"। সংকলনের নামকরণ করা হয়েছে প্রথম কবিতা "মুখর ভালবাসা"কে।

সেই তুলনায় মানিকলাল দাসের "একটু উষ্ণতার জন্য" আমাদের ততখানি তৃপ্তি দেয়নি। যদিও এ কালকের প্রত্যাশা "অতি সাধারণ মানুষের ব্যথা-বেদনায় পরিপূর্ণ সহজ সরল ভাষায় রচিত কবিতাগুলি পাঠক মহলে সাদরে গৃহীত হোক।"

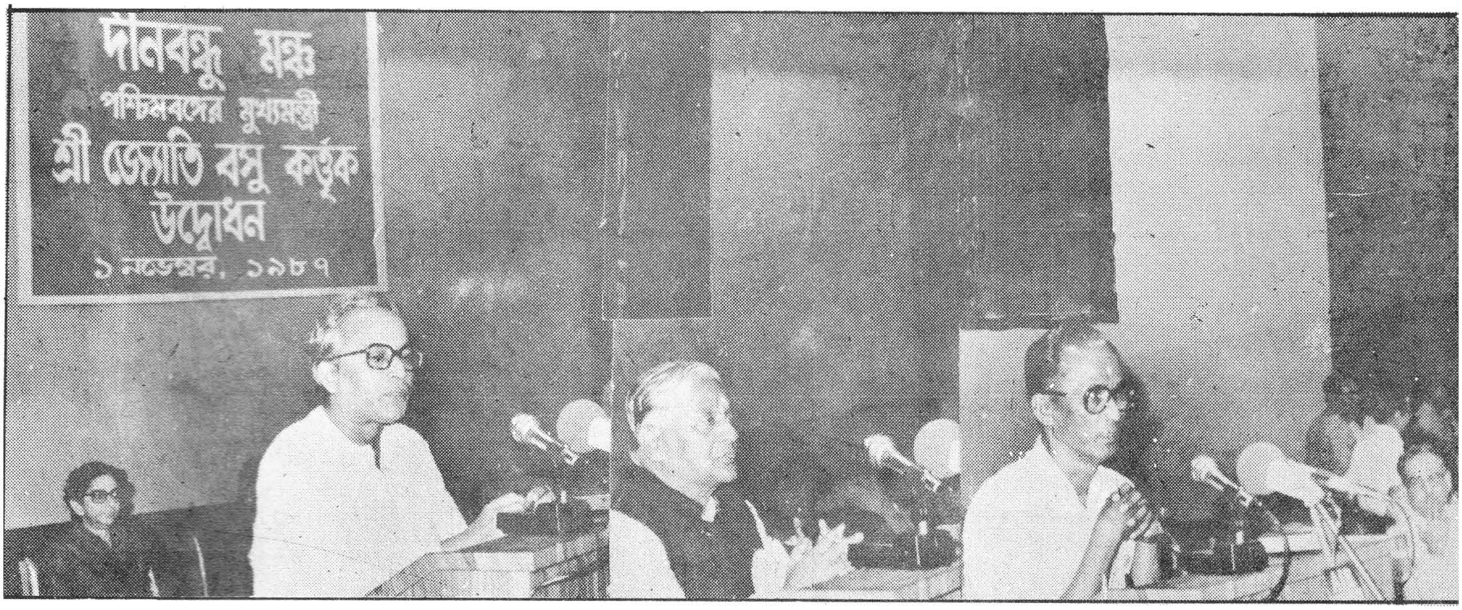
প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

ছোটদের কচিপাতাঃ শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৯৪, ১৭, গ্রীন অ্যাভিনিউ, সন্তোষপুর, কলকাতা–৭৫, সম্পাদকঃ সমর পাল। দাম চার টাকা

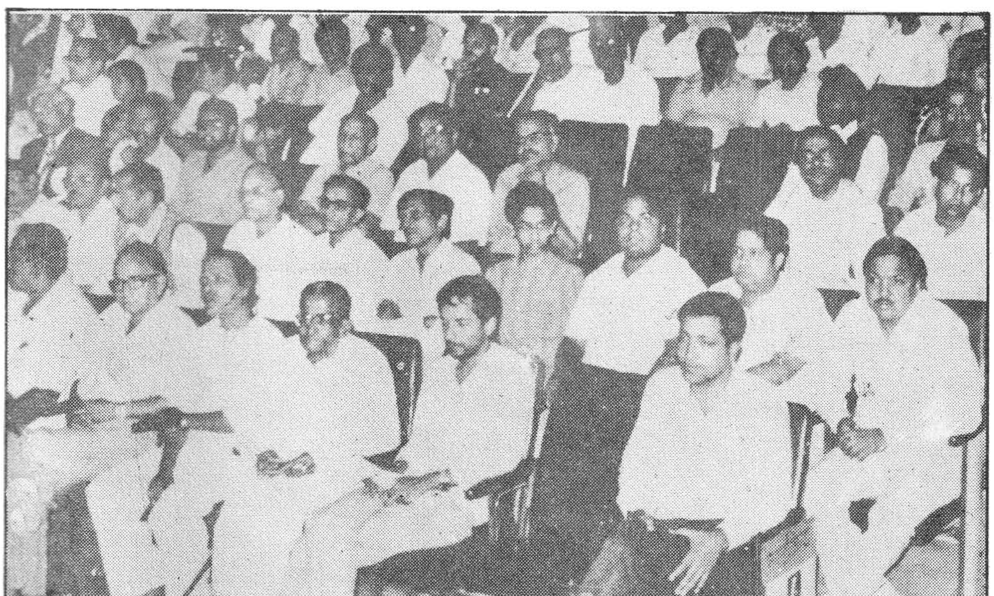
শিশুদের জন্য সুস্থ জীবনবোধের অনুকূল অপরূপ সব ছড়ায় গাঁথা এই শারদীয়া সংখ্যাটি। শিশুরা শুধুমাত্র বিমূর্ত ছড়া উপভোগ করতে পারে না, সম্পাদক শিশুদের এই মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে সচেতন বলেই সুন্দর সুন্দর ছবিতে সাজিয়ে তুলেছেন ছড়াগুলিকে। শিশুদের উপযোগী পত্রিকা সম্পাদনা করা সবচেয়ে দুরূহ। শুধুমাত্র শিশুমনকে জানলেই চলে না, তার জন্য উপযুক্ত সম্ভার সংগ্রহ করে পরিবেশনে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিতে হয়। শ্রীসমর পাল অনন্য যোগ্যতায় এইসব কষ্টকর প্রতিকূলতা উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

সব ছড়াই চার লাইনের। বঙ্গ সংস্কৃতিকে রাজনৈতিক-ভৌগোলিক বিভাজনের আওতায় আনা যায় না। এই বোধ থেকেই বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি ছড়াও সঠিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শিশুদের মনে দেশ-কাল-সময়ের কোনো সীমাবদ্ধ গন্ডি নেই। শিশু চির-পুরাতন ও চিরকালের। তার বয়েস বাড়ে না। প্রখ্যাত ও নবীন ছড়াকারদের লেখায় সমৃদ্ধ এই সংখ্যাটি প্রতিটি শিশুর কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে, এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। 'তারুণ্যের ধারা রবে নিত্য বহমান,'–'ছোটদের কচিপাতার সম্পাদকমন্ডলীর কাছে এই প্রত্যাশাই করি।

–দিব্যজ্যোতি মজুমদার



শিলিগুড়ি তথ্যকেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করছেন তথ্য ও সংস্কৃতি, পূর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী শ্রীনির্মল বসু এবং পার্বত্য উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীতামাং দাওয়া লামা। নিচে প্রেক্ষাগৃহে শ্রোতাদের একাংশ (সংবাদ ভিতরে)।



পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রিসিশন লিথোগ্রাফার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫/৩, গ্রীন পার্ক কলিকাতা ৭০০০১৯ হইতে মুদ্রিত।



যুবভারতী ক্রীড়াংগনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। উপরে দর্শকের আসনে উপবিষ্ট ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রী শ্রীসুভাষ চক্রবর্তী, মেয়র শ্রীকমল বসু, কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শ্রীঅজিতকুমার পাঁজা, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু, কেন্দ্রীয় বাণিজ্য রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রশান্ত শূর ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি। নিচে স্টেডিয়ামের মাঠে রাজ্যের দুই প্রধান ফুটবল দলের ক্রীড়ানুষ্ঠান।

–বসুমতী পত্রিকার সৌজন্যে। ছবি : শ্রীসুদর্শন মুখোপাধ্যায়।